প্রশিক্ষণ মডিউল

ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

Training Module

Dairy Herd Production and Health Management

প্রশিক্ষণ মেয়াদঃ ৫ দিন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়।

প্রশিক্ষণ মডিউল

ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

পান্ডুলিপি রচনা

ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

ড. মোঃ গোলাম রব্বানী

ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রকল্প পরিচালক

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

উপদেষ্টা

ডা. আবদুল জব্বার শিকদার

মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

পরামর্শ ও মতামত প্রদান

ডা. মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন খান

কল্যাণ কুমার ফৌজদার

ডা. অরবিন্দ কুমার সাহা

ড. জীবন চন্দ্র দাস

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

‘‘বাণী’’

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বৃহত্তর কৃষি সেক্টরে গ্রহণ করা হচ্ছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রাণিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে গ্রহণ করা হয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।

বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রাণিজ আমিষ, দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ‘‘আমার গ্রাম, আমার শহর’’ বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের এই আমূল পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে তৃণমূল খামারি, উদ্যোক্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রাণিসম্পদ সেক্টর থেকে পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরণের বিষয়ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করছেন। প্রাণিজ আমিষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এসডিজি ২০৩০ এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি, রোগনিয়ন্ত্রণ ও টেকসই উন্নয়ন, সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য দিকনির্দেশনামূলক “ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশাকরি, মডিউলটি সংশ্লিষ্টদের কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনায় মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিজেদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। ফলে তারা পেশাগত দিক থেকে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে খামারিদের সেবা প্রদান এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিশেষ ভুমিকা রাখবেন। যুগোপযোগী এ মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যারা মেধা, মনন ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

‘‘বাণী’’

গাঙ্গেয় পললভূমিতে গড়ে ওঠা আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলানিকেতন। ইতিহাসের নানা ধাপ পেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানের আসনে অভিষিক্ত। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজির সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অপরীসিম সক্ষমতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের অপার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচনের পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিগত দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টেকসইজাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ‘‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প’’ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, মার্কেট লিংকেজ গড়ে তোলা এবং ভ্যালুচেইনের উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় ডেইরি এবং পোল্ট্রি সেক্টরে মোট ৬ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগী খামারি নির্বাচন পূর্বক নির্বাচিত খামারিগণকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে দিক নির্দেশনামূলক যুগোপযোগী “ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ হবে। আমি আশাকরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে মডিউলটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ মডিউল রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

রওনক মাহমুদ

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"বাণী"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভিশন ২০২১ এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মি.লি. দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস ও সপ্তাহে দুইটি করে ডিম সরবরাহের হিসাবে বাৎসরিক দুধ, মাংস ও ডিমের মোট চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে দুধের প্রাপ্যতা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি এখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ ঘাটতি শূন্যের কোটায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৫দিন ব্যাপী "ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণীত এ মডিউলটি সংশ্লিষ্টদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা এবং প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি, এ মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডা. আবদুল জব্বার শিকদার

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘‘মুখবন্ধ’’

উন্নত জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার আশৈশব লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত জাতির মর্যাদা লাভ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োজিত রয়েছেন। দক্ষ জনশক্তি সৃজনের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল প্রশংসিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এসডিজি-২০৩০ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাণিসম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের প্রথম বাহন কুকুর থেকে শুরু করে দ্রুত গতির অশ্ব মানুষের সহজাত সচলতায় অধিকতর গতি সঞ্চার করেছে। পশুপালন যুগে মানুষের খাদ্যেও প্রধান উৎস ছিল প্রাণি জগৎ। কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে প্রাণি শক্তির বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে। শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক মানুষ সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়নে প্রাণিজাত খাদ্যকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানবজাতির ইতিহাসে প্রাণিতাই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। খাদ্যচক্রে প্রাণি ও উদ্ভিদের যেমন পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে, তেমনি মানব জীবন প্রতি পদে খাদ্যচক্রের এই বৃত্তবর্তী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” তাই দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে তথ্য-উপাত্ত সক্ষমতার সমার্থক হিসেবে গণ্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রাণি সম্পদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা, খামারিদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ও উন্নততর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের সূত্রধন হিসেবে কাজ করেছেন। কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি একই সূত্রে গাঁথা। নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংশ্লিষ্টদের অধিকতর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের উপর তাই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যেন প্রশিক্ষকগণকে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠদান এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে কার্যকর পাঠ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। “ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই মডিউলটি প্রনয়নে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রশিক্ষণ নোট ঃ

''ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা'' বিষয়ক মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি গবাদিপশুর খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি মডিউলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে বিবেচিত হবে। গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে মডিউলটিতে ২৫টি সেশন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটি-কে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং দুপুর ১.০০-২.০০ পর্যন্ত বিরতিসহ বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রশিক্ষণ ক্লাশসমুহ সিডিউল মোতাবেক যথাসময়ে শুরু ও শেষ করা হবে। মডিউলের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ সুচী প্রনয়ণ করা হবে। প্রতিটি সেশনের জন্য একজন করে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক/রিসোর্স পার্সন থাকবেন। তিনি তাঁর বিষয়বস্তু মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ সহযোগী প্রশিক্ষণ সামগ্রী (খাতা, কলম, নোট, লেকচার শীট, মডিউল ইত্যাদি) প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে পৌঁছে দিবেন।

প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন এর জন্য করণীয় ঃ

১. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিস্কার ও স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে কথা বলুন। যাতে সবাই শুনতে ও বুঝতে পারে।

২. ভিজ্যুয়াল এইড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পয়েন্টার ব্যবহার করুন।

৩. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান সম্পর্কে জেনে নিন।

৪. আপনার উপস্থাপিত বিষয় কম্পিউটারে খুলুন এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন।

৫. বিষয়ের উপর নির্ধারিত মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষনার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

১. গবাদিপশুর খামার ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কলাকৌশলের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের পরিচিত করা।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি গ্রহন ও ব্যবহারে কৃষকদের সহজে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩. এলডিডিপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও ষ্টেকহোল্ডারদের পরিচিতি ও সম্পৃক্তকরন।

৪. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের গবাদিপশুর খামার ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি সর্ম্পকে ধারনা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

৫. আধুনিক কলা কৌশল ব্যবহারে পরিবেশ বান্ধব গবাদিপশুর খামার স্থাপনে দক্ষ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খামারি ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

১. অতি সহজে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশুর খামার ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন।

২. খামারি পর্যায়ে গো-খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।

৩. কৃষক ও খামারি পর্যায়ে গবাদিপশু পালনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৪. আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালনে খামারি ও কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা ও কারিগরী পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হবেন।

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশুর খামার পরিচালনা বিষয়ে দক্ষ হবেন।

বি. দ্র. : প্রশিক্ষনার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কারও কোন মতামত থাকলে প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী/প্রকল্পের ট্রেনিং উইং-কে অবহিত করুন যা পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

সূচিপত্র ঃ

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তার ব্যবহার	
	২	এসডিজি এবং এসডিজি বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা	
	৩	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর পরিচিতি	
	৪	বাংলাদেশে ডেইরি শিল্পের উন্নয়ন	
	৫	ডেইরি খামারে প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং রেকর্ড সংরক্ষণ	
২য়	৬	ডেইরি প্রাণির প্রজনন ব্যবস্থাপনা	
	৭	ডেইরি প্রাণির বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা	
	৮	প্রজেনি টেস্টিং ও জেনোমিক পদ্ধতিতে প্রজনন ষাঁড় বাছুর নির্বাচন	
	৯	ডেইরি প্রাণিতে ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি এবং সেক্সড সিমেন এর ব্যবহার	
	১০	ডেইরি প্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা	
৩য়	১১	ডেইরি প্রাণির জন্য সম্পূর্ন মিশ্রিত রসদ এবং খাদ্যে রুমেন বাইপাস প্রোটিনের গুরুত্ব	
	১২	ডেইরি প্রাণির সবুজ ঘাস (ফডার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ	
	১৩	ডেইরি প্রাণির খাদ্য হিসেবে হাইড্রোপনিক ঘাস এবং এ্যালজি উৎপাদন	
	১৪	ডেইরি প্রাণির পরিচর্যা এবং খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রম	
	১৫	ডেইরি প্রাণির পরিষ্কার দুধ দোহন, শীতলীকরণ ও পরিবহন	
৪র্থ	১৬	দুধ প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ	
	১৭	ডেইরি প্রাণির প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	
	১৮	ডেইরি প্রাণির জুনোটিক রোগ ব্যাধি ব্যবস্থাপনা	
	১৯	ডেইরি প্রাণির ক্ষুরা রোগ ও লাম্পি স্কিন ডিজিজ	
	২০	ডেইরি প্রাণির ফডারজনিত জৈব বিষক্রিয়া ও প্রতিরোধ	
৫ম	২১	ডেইরি প্রাণিতে স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার	
	২২	ডেইরি প্রাণির রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	
	২৩	টিকার গুণগতমান রক্ষায় কুল চেইন ব্যবস্থাপনা	
	২৪	ডেইরি প্রাণির জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	
	২৫	ডেইরি প্রাণির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বায়োগ্যাস ও বায়োকম্পোষ্ট তৈরী	

সেশন-১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তার ব্যবহার

(National Intregrity Strategy and it's Application)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- শুদ্ধাচারের ধারণা
- শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন
- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বিভাগীয় পরিকল্পনা
- শুদ্ধাচারী কর্মকর্তার গুণাবলী

শুদ্ধাচারের ধারণা ঃ

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যাক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যাক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রুপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহিত পদক্ষেপ ঃ

ক) বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ, এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যাক্তিমানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল :

১. মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);
২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৪. সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৫. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৬. জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মনুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);
৮. কোন ব্যাক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

খ) যে কোনও ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা সুযোগ ব্যবহারের উদ্যোগে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। সেজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal code- এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে 'দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য

সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হল: 'খ) The Prevention of corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)- এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (গ) The penal code 1860 (Act XLV of 1860)-এর section 161-169,217,218,408,409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;' এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। সম্প্রতি প্রণীত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত।

সহজ বর্ণনায় এসব অপরাধ হল সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিস গ্রহণ; সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিস গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ; কোন মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারি কর্মচারীদের আইন অমান্যকরণ; সরকারি কর্মচারীদের বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা; কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমাণ্যকরণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ; অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ; অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা; জালিয়াতি; সরকারি নথিপত্র ও রেজিষ্টার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ; হিসাবপত্র বিকৃতকরণ, অর্থ পাচার ইত্যাদি। অন্যবিধ আর্থিক দুর্নীতি, অনুপার্জিত সম্পত্তি লাভ ও ভোগ, অর্থ সম্পত্তি পাচারের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আয়কর আইনে কৃত অপারাধকেও দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কেবল জনপ্রশাসনেই নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও এনজিও-র দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর আছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসৃত হয়। এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, নতুন নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'- এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি প্রতিরোধকে জোরদার করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাশ করে সরকার জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির দাবি ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটি বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা ঃ

ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যাক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটি চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যাক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষ আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।

খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্র এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত- আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলী পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা ভাবে আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসেবে অভিহিত। যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যাক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঃ ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন **২.** জাতীয় সংসদ **৩.**বিচার বিভাগ **৪.**নির্বাচন কমিশন **৫.**অ্যাটর্নি জেনারেল **৬.**সরকারি কর্ম কমিশন **৭.**মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় **৮.**ন্যায়পাল **৯.** দুর্নীতি দমন কমিশন **১০.** স্থানীয় সরকার

আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঃ ১.রাজনৈতিক দল ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ৩. এনজিও ও সুশীলসমাজ ৪.পরিবার ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬. গণমাধ্যম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য ঃ

রুপকল্প **(Vision)** ঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

অভিলক্ষ্য **(Mission)** ঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

বিভাগীয় কার্যক্রমে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা। এই কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শুদ্ধাচার বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সচেষ্ট থাকেন।

কার্যক্রমসমুহ ঃ

১) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহন ঃ ১.১) নৈতিকতা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠান; ১.২) নৈতিকতা বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; ১.৩) স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; ১.৪) উত্তম চর্চার তালিকা প্রনয়ন।

২) দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ঃ ২.১) অংশীজনের অংশগ্রহনে সভা; ২.২) নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি বিধিমালা; ১৯৮২, সরকারী কর্মচারী বিধিমালা; ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠান; ২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩) শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রনয়ন/হালনাগাদকরণ।

৪) তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ ৪.১) স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; ৪.২) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহন; ৪.৩) দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোলফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরন ও সকল কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ; ৪.৪) তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমুহ হালনাগাদকরণ; ৪.৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সর্ম্পকে কর্মকর্তা কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ।

৫) ই-গভর্নেস বাস্তবায়ন ঃ ৫.১) দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস এর ব্যবহার; ৫.২) ভিডিও/ অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন; ৫.৩) দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার; ৫.৪) ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন।

৬) উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ঃ ৬.১) বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ন ও অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ৬.২) চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজিকৃত সেবা পরিবীক্ষণ।

৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ ঃ ৭.১) পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১ (২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬ (৬) অনুয়ায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ন; ৭.২) স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; ৭.৩) প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; ৭.৪) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরন।

৮) বিভাগ/দপ্তরের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ ৮.১) সেবা সপ্তাহ চালুকৃত ও প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম মনিটরিং; ৮.২) রাজস্ব ও উন্নয়নখাতের ররাদ্দ সময়মত ছাড় নিশ্চিতকরণ; ৮.৩) বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্ব্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৯) শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রনোদনা প্রদান ঃ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ভাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবছর পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ঃ ১০.১) প্রতি বছর নির্দ্ধারিত সময়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পণনা প্রনয়ন করে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে দাখিল; ১০.২) নির্দ্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরন।

শুদ্ধাচারী সরকারী কর্মকর্তার গুনাবলী ঃ

একজন সরকারী কর্মকর্তা হবেন-

১) সৎ : বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিস গ্রহন বা বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ এবং অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিরত থাকবেন।

২) দুর্নীতিমুক্ত : তিনি সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন এবং কোন দুর্নীতিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবেন না।

৩) ন্যায় পরায়ন : তিনি হবেন ন্যায় পরায়ন। সকলের প্রতি সুবিচার এবং নায্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন

৪) নীতিবান : তাঁর নিজস্ব বিবেকই হলো নীতির উৎস। তিনি সর্বদা সুনীতি নিয়ে চলবেন। তাঁর কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।

৫) দায়িত্বশীল : নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন।

৬) দাপ্তরিক কর্মে স্বচ্ছ : তিনি স্বচ্ছতার সাথে সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন এবং সকল প্রকার তথ্য অধিকার, দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

৭) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল : তিনি সকল প্রকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এবং আইনের আওতায় তিনি তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৮) বুদ্ধিমান : তিনি সকল দাপ্তরিক কাজ ভেবে চিন্তে করবেন এবং সহকর্মীদের নৈতিক মতামত ও ইচ্ছার মূল্য দিবেন।

৯) বন্ধুসুলভ : সহকর্মীদের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করবেন।

১০) কর্মদক্ষ : তিনি পেশাগত কাজ-কর্মে দক্ষ হবেন।

১১) সেবা ও সহযোগী মনোভাবাপন্ন : সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সদাচারন ও সবোর্চ্চ সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবেন এবং তিনি হবেন সহযোগিতাসুলভ।

১২) সময়ানুবর্তী : তিনি সকল কাজ সময়মত সম্পন্ন করবেন এবং নিয়মিত ও সময়মত অফিসে উপস্থিত থাকবেন।

১৩) পরিচ্ছন্ন : তিনি তার দপ্তর সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তিনি নিজে পোষাকে পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং সহকর্মীদেরও পরিচ্ছন্ন থাকতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৪) শ্রদ্ধাশীল : জৈষ্ঠ্য সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

১৫) ভাল চরিত্রের অধিকারী : তিনি সর্বদিক দিয়ে চরিত্রবান হবেন। নিজে চরিত্রবান না হলে অন্যকে তা হতে বলা যায় না। চরিত্রবান ব্যাক্তি সমাজের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য।

সেশন-২

এসডিজি এবং এসডিজি বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা

(SDG and SDG Linkage to Livestock Sector)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- SDG সম্পর্কে ধারণা
- SDG এর লক্ষ্য
- SDG বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা ও কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঃ Sustainable Development Goal-SDG

জাতিসংঘ ঘোষিত ১৫ বৎসর ব্যাপী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা MDG এর মেয়াদ শেষ হয় ২০১৫ সালে। বিশ্বের উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'' (SDG) এর খসড়া চূড়ান্ত হয়। ৭০ তম অধিবেশনে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে SDG এর মেয়াদ শুরু হয়।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ''২০৩০ এজেন্ডা'' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মূলমন্ত্র হবে; ''কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)'' নীতি অনুসরণ। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যু হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)'' অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিরুপণের জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ঃ

১.	সর্বত্র সবধরনের দারিদ্রের অবসান
২.	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
৩.	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪.	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি
৫.	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী-মেয়েদের ক্ষমতায়ন
৬.	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৭.	সকলের জন্য সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
৯.	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ।
১০.	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ।
১১.	অর্ন্তভূক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।
১২.	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা।
১৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী কর্মব্যবস্থা গ্রহন।

১৪.	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর, ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।
১৫.	স্থলজ বাস্ততন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র হ্রাস প্রতিরোধ।
১৬.	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অর্ন্তভূক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মান।
১৭.	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তন্মেধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং অনুযায়ী ৯টি অভীষ্ট (নং-১,২,৩,৮,৯,১০,১২,১৫, ১৭) এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এসডিজি লিংকেজ ঃ

প্রাণিসম্পদ সেক্টর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী, খামারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার এ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সর্ববৃহৎ প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' (LDDP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে SDG লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখবে।

প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অধিদপ্তরের প্রস্তুতি ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সমূহ ঃ

১. দারিদ্রতা অবসানকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বিভিন্ন ইনপুটস সরবরাহ করে বেকার ও ক্ষুদ্র খামারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে ফলে তাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্রতা প্রশমন হবে।

২. পুষ্টি নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্যে গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অনুরুপ কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে ও হচ্ছে।

৩. সুস্বাস্থ্য উন্নয়নে জুনোটিক রোগব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পোষা পশু-পাখির টিকাদান, রোগাক্রান্ত পশু সনাক্তকরণ ও সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবছর ঈদুল আযহার কোরবানির হাটে জবাইযোগ্য পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম দেশের সকল পশুরহাটে দায়িত্ব পালন করে থাকে। ভবিষ্যতে এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হবে।

৪. গুনগত কারিগরী উচ্চ শিক্ষার প্রসারে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে। প্রাণিসম্পদ খাতে সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া গোপালগঞ্জে জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্টি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ফলে গুনগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীদের উৎপাদিত দুধ,মাংস ও ডিমের পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে মানসম্মত প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

৫. নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারীর অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের সম্ভাবনায় ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাত। চলমান উন্নয়ন বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাতে নারীর অংশগ্রহনের হার প্রায় ৫০%। নতুন প্রকল্পে নারীরা প্রতক্ষ্যভাবে সম্পৃক্ত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. টেকসই জ্বালানী উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে 'ইন্টিগ্রেটেড লাইভস্টকম্যানিউর ম্যানেজম্যান্ট' এর এ্যকশন প্ল্যান প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে টেকসই জ্বালানীর ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৭. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ খাতের শিল্পায়ন ও রপ্তানীমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ফলে প্রাণিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্প্রসারিত নবভিত্তির রচনা করতে পারবে।

৮. উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এবং পশুরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে কোয়রেন্টাইন স্টেশন স্থাপনসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অবকাঠামোতে উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৯. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বাস্তসংস্থান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

১০. সুশাসন নিশ্চিতকল্পে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অধিকতর প্রযুক্তির ব্যবহার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল পালন করা হবে।

১১. প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য সহ অন্যান্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, প্রযুক্তির হস্তান্তর, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য সমঝোতা স্মারক ইত্যাদি কার্যক্রম ক্ষেত্রবিশেষ শুরু ও বেগবান করা হবে।

সেশন-৩

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর পরিচিতি

(Livestock and Dairy Development Project at a glance)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- এলডিডিপি এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- এলডিডিপি-এর কম্পোনেন্ট এর ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট
- এলডিডিপি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটির মেয়াদ ৫ বছর। পহেলা জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রাণিজাত পণ্য প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করা। প্রকল্পের উল্লেযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

১. প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিপুষ্টি ও প্রাণি প্রজনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধি করা।
২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টরে ৫৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরী করা। প্রোডিউসার গ্রুপগুলিকে বাজার ব্যবস্থার সাথে লিংকেজ স্থাপন এবং মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটানো।
৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ নীতিমালা তৈরী, জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন, তদারকি, মূল্যায়ন এবং উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।
৪. নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন এবং প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৫. প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থা চালুকরনের মাধ্যমে খামারিদের বিনিয়োগ নিরাপদকরণ এবং পরিবেশ সহায়ক প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ	সাব-কম্পোনেন্ট	প্রধান পদক্ষেপ সমূহ
কম্পোনেন্ট-A উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ইনোভেশন	• সাব-কম্পোনেন্ট -A1 প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলোকে সহায়তা • সাব-কম্পোনেন্ট-A2 উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা	• একই পণ্যগুলোর প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে সহায়তা প্রদান ও তাদের ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধি • ফিডিং এবং নিউট্রিশন • রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ • গৃহায়ন ও ব্যবস্থাপনা • ডেমোনেস্ট্রেশন, প্রদর্শনী

কম্পোনেন্ট-B মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট	• সাব-কম্পোনেন্ট-B1 প্রডাক্টিভ পার্টনারশিপের মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ	• এগ্রিবিজনেস (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME), ব্যবসায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FIS), প্রসেসর, অনগ্রসর কৃষি ব্যবসা সমূহ) এবং লাইভস্টক প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন • স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম • পুষ্টি সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রচারণা।
	• সাব-কম্পোনেন্ট-B2 প্রাণিসম্পদের জন্য সরকারি অবকাঠামো	
	• সাব-কম্পোনেন্ট-B3 ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিউট্রিশন	
কম্পোনেন্ট- C ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি	• সাব-কম্পোনেন্ট-C1 প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম	• সাব-সেক্টর গুলোর তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C2 খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদান। • খাদ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে ICT ব্যবহার
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C3 প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন	• প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য পূর্বশর্ত নির্ণয় • জাতীয় প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজ তৈরী • সচেতনামূলক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ এবং মোটিভেশনাল কার্যক্রম
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C4 আকস্মিক ঘটনার জরুরি প্রতিক্রিয়া	• কোন প্রতিকূল প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে ফান্ড মোবাইলাজকরণ
কম্পোনেন্ট-D প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	কম্পোনেন্ট-D ডিএলএস হেড কোয়ার্টার এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা	• ঢাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং • ইউএলও (ULO), ডিএলও (DLO), এবং ডিডি (DD Office) অফিসে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIUs) প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের ইনপুট (INPUTS) ঃ

টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টস/কারিগরী সহায়তা শক্তিশালী করে-

১. প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি
২. নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সৃষ্টি
৩. সরকারি ও বেসরকারি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ প্রাণিচিকিৎসা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পশুপ্রজনন সেবা সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি
৪. টেকনিক্যাল এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস উন্নয়ন
৫. কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রোডিউসারদের আর্থিক বিষয়াবলিতে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি
৬. নবায়নযোগ্য শক্তিতে কৃষি উদ্যোক্তাদের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি

প্রকল্পের বিনিয়োগ (INVESTMENTS) ঃ

১. লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো
৩. ফিজিবিলিটি স্টাডিজ (DDB, BDRI, BPRI, TMR, DTMR)
৪. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু চেইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাজার
৫. কো-ফাইন্যান্স পদ্ধতিতে বিজনেস প্ল্যান
৬. নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বায়োডাইজেস্টার, সোলার প্যানেল)
৭. স্কুল মিল্ক ফিডিং প্রোগ্রাম

প্রকল্পের আউটপুট (OUTPUTS) ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দক্ষতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের জন্য উন্নততর সেবা প্রদান-

১. সেবা, ইনোভেশন ও বাজারীকরনের কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্ব স্ব ভ্যালু চেইনে প্রতিষ্ঠিত প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরি।
২. উন্নততর কারিগরী ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সহায়তা সেবা ।
৩. নলেজ প্ল্যাটফর্ম ও লাইভস্টক ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে নলেজ প্রোডাক্ট বিতরণ।
৪. নির্ধারিত লাইভস্টক ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করা।
৫. প্রডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক উদ্যোক্তাদের উন্নত, আবহাওয়া সহিষ্ণু ও প্রোডাক্টিভিটি বর্ধক প্রযুক্তি আত্নীকরণ।
৬. ক্রিটিকাল ভ্যালু চেইন অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার ।
৭. ক্রিটিক্যাল রিনিউয়েবল এনার্জি/নবায়নযোগ্য শক্তির অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা।

প্রকল্পের আউটকাম (OUTCOMES) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধন ও সহনশীলতা বৃদ্ধি।
২. প্রোডিউসার গ্রুপ ও প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নততর নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।
৩. বিভিন্ন উন্নত সুবিধাদিতে (কোয়ারেন্টাইন, ব্রিডিং, স্টোরেজ, প্রসেসিং , প্যাকেজিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, আই সিটি) এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এক্সেস।
৪. প্রকল্প এলাকাতে রিনিউয়েবল এনার্জির সাপ্লাই বৃদ্ধি।
৫. কারিগরী ও বিজনেস এডভাইজরি সার্ভিসে প্রডিউসার গ্রুপের ও কৃষি উদ্যোক্তাদের এক্সেস বাড়ানো এবং তাদের দ্বারা বিনোয়োগে অর্থায়ন।
৬. বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ গুনগতমান সম্মত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের ইমপ্যাক্ট (IMPACTS) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন ২. দারিদ্রতা হ্রাস ৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৪. জেন্ডার ইকুইটি ৫. জনস্বাস্থ্য

এলডিডিপি এর আওতায় বাস্তবানাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমুহ ঃ

১. বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ৩০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (VMCC) স্থাপন।
২. আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব (DH) স্থাপন।
৩. দুধ উৎপাদন এলাকায় ১৭৫টি মিল্ক কুলিং সেন্টার (MCC) স্থাপন।
৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪১৫টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরন ইউনিট স্থাপন।
৫. পশুজবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩টি আধুনিক স্লটারহাউজ নির্মাণ।
৬. জেলা পর্যায়ে ২০টি স্লটারহাউজ নির্মাণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে ১৯২টি মাংসের বাজার উন্নয়ন।
৮. খামারের বর্জ্য দিয়ে বায়োগ্যাস এবং বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে ১০জন বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরী।
৯. ভেটেরিনারি সেবার মানউন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন।
১০. ৩৬০ টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু।
১১. ২৩৮টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।
১২. ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে ২০০০টি স্কুলে মিল্ক ফিডিং (SMF) কর্মসূচী পরিচালনা।
১৩. প্রকল্প এলাকায় পাইলট আকারে প্রাণিসম্পদ বীমা কার্যক্রম চালু।
১৪. প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা খামারী দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) তৈরী।
১৫. প্রকল্প এলাকায় ৫৫০০টি প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রোডিউসার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা।
১৬. প্রকল্প এলাকায় ১৯১০০০ জন সুফলভোগী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৭. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৮. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন।
১৯. প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
২০. ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

সেশন-৪

বাংলাদেশে ডেইরি শিল্পের উন্নয়ন

(Dairy Industry Development in Bangladesh)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- বাংলাদেশে গো প্রজনন নীতিমালা
- বাংলাদেশে ডেইরি উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের গো প্রজনন নীতিমালা ঃ

বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে প্রকৃত পক্ষে ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বৃহৎ আকারে সম্প্রসারিত হতে থাকে। এসময় কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার সাভার এ বাংলাদেশের আবাহাওয়ায় উপযোগী জাত নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং বিশেষজ্ঞগন দেশের গরুর জাত উন্নয়নকল্পে এলাকাভিত্তিক একটি প্রজনন নীতিমালা প্রনয়ন করেন যা ১৯৮২ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এই নীতি অনুযায়ী শহর ও শহরতলী এবং যে এলাকায় দুধ উৎপাদন বেশী হয় সে সকল স্থানে খাঁটি শাহীওয়াল জাতের মা ও খাঁটি ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের সিমেন বা বীজ দ্বারা উৎপাদিত ষাঁড়ের (৫০% এফ ×৫০% এসএল) সিমেন বা বীজ এবং গ্রামীণ এলাকায় দেশী জাতের গাভী ও খাঁটি ফ্রিজিয়ান জাত দ্বারা উৎপাদিত (৫০% এল ×৫০% এফ) ষাঁড়ের সিমেন বা বীজ ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে জাতীয় প্রাণিসম্পন উন্নয়ন নীতিমালা- ২০০৭ প্রাণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রজনন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। এই নীতিমালার আলোকে মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয় যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রজনন নীতিমালা ঃ

খামার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গবাদিপশুর মোট সংখ্যাকে (গরু ও মহিষ) ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) অধিক মাত্রার ইনপুট সরবরাহ ঃ যেখানে গবাদিপশুকে সম্পূর্ণরূপে খামারে আবদ্ধ রেখে লালন পালন করা। এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ন আবদ্ধ (Intensive) পদ্ধতি বলে।

২) মধ্যম মাত্রার ইনপুট সরবরাহঃ যেখানে গবাদিপশুকে আংশিক ভাবে খামারে আবদ্ধ অবস্থায় লালন পালন করা হয় এবং আংশিক ভাবে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে সেমি অর্দ্ধ আবদ্ধ (Semi-Intensive) পদ্ধতি বলে।

৩) নিম্ন মাত্রার ইনপুট সরবরাহঃ যেখানে গবাদিপশুকে প্রথাগত পদ্ধতিতে খাদ্য শস্যের উচ্ছিষ্ট এবং প্রাকৃতিক ঘাসের উপর নির্ভর করে লালন পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে যৎ সামান্য সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে প্রথাগত (Traditional) পদ্ধতি বলে।

ক) স্বল্প মেয়াদী নীতিমালা ঃ-

১. ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান গাভীকে (প্রতিদিন দুধ উৎপাদন ১০ কেজি বা অধিক) বিদেশ হতে আমদানীকৃত প্রজেনি টেষ্টেড হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো। উল্লেখ্য যে, উক্ত হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০০-১০০০০ কেজি (৩০৫ দিনের দুধ উৎপাদন) হতে হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন নিবন্ধনকৃত খামরীদের মধ্য থেকে সর্ব্বোচ্চ ১০% খামারীকে তাদের খামারের উৎপাদন দক্ষতার উপর ভিত্তি করে উক্ত নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে।

২. সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত সংকর জাতের হলিস্টিন-ফ্রিজিয়ান গাভীকে (দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৬-১০ কেজি/দিন) প্রজেনি টেস্টেড ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। উক্ত সংকর জাতের ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৫০০ কেজি (৩০৫ দিনের দুধ উৎপাদন) হতে হবে। গাভী (এলএফ) ×ষাঁড় (এলএফ) বিশুদ্ধ শাহীওয়াল অথবা সংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে বিশুদ্ধ শাহীওয়াল জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো হবে। উক্ত ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কমপক্ষে ২৫০০ কেজি বা ততোধিক হতে হবে। গাভী(এসএল) × ষাঁড়(এসএল) অথবা গাভী(এল × এসএল) ×ষাঁড় (এসএল)

৩. প্রথাগত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত দেশী গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড/পিডিগ্রি জানা শাহীওয়াল, পাবনা, রেড চিটাগাং, মুন্সিগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চলের উন্নত দেশী ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। গাভী (এল) × ষাঁড় (এসএল), পাবনা গাভী × পাবনা (পিডিগ্রি জানা) ষাঁড়(উন্নত), আরসিসি গাভী × আরসিসি ষাঁড়(উন্নত), মুন্সিগঞ্জ গাভী × মুন্সিগঞ্জ ষাঁড়(উন্নত), দেশী গাভী × উন্নত দেশী ষাঁড় (দেশের অন্যান্য অঞ্চলের)।

খ) মধ্য মেয়াদী নীতিমালা ঃ

১. ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান গাভীকে প্রজেনি টেষ্টেড হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো। উক্ত হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০০-১০০০০ কেজি (৩০৫ দিনের দুধ উৎপাদন) হতে হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ যে সকল খামারে ১০ বা ততোধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকবে সে সকল খামারে উক্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। গাভী (এলএফ) × ষাঁড় (এফ)।

২. সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত সংকর জাতের হলিষ্টিন-ফ্রিজিয়ান গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান ও ৫০% স্থানীয় জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। উক্ত সংকর জাতের ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬০০০ কেজি (৩০৫ দিনের দুধ উৎপাদন) হতে হবে। গাভী(এলএফ) ×ষাঁড় (এফ)।

বিশুদ্ধ শাহীওয়াল অথবা সংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে শাহীওয়াল জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো হবে। উক্ত ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০০ কেজি বা ততোধিক (৩০৫ দিনের দুধ উৎপাদন)। গাভী (এসএল) ×ষাঁড় (এসএল), গাভী (এল × এসএল) ×ষাঁড়(এসএল)।

৩. প্রথাগত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত দেশী গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড/পিডিগ্রি জানা শাহীওয়াল, পাবনা, রেড চিটাগাং ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উন্নত দেশী ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। গাভী(এল) ×ষাঁড় (এসএল), পাবনাগাভী × পাবনা (পিডিগ্রি জানা) ষাঁড় (উন্নত), আরসিসি গাভী × আরসিসি ষাঁড় (উন্নত), মুন্সিগঞ্জ গাভী × মুন্সিগঞ্জ ষাঁড় (উন্নত), দেশী গাভী × উন্নত দেশী ষাঁড় (দেশের অন্যান্য অঞ্চলের) দেশে দীর্ঘ মেয়াদী একটি উপযোগী প্রজনন নীতিমালা প্রনয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্ন্তভূক্ত করে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদীতে বাস্তবায়নাধীন প্রজনন নীতিমালার ফলাফল মূল্যায়ন করে দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালার কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে ডেইরি উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রম ঃ

দেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া থেকে অনুদান হিসেবে ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের ১২৫টি গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। সাভার কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামারে উক্ত আমদানিকৃত ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর ক্রসব্রিডিং করানো হয়। উৎপাদিত ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের বাছুরের উৎসাহজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে সমগ্র দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এসময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২২টি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসব কেন্দ্র থেকে ফ্রিজিয়ান ও শাহীওয়াল জাতের তরল সিমেন সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু করা হয়। দেশীয় গবাদিপশুর উন্নয়নে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে উন্নতমানের প্রায় ৪.৩ লক্ষ ডোজ হিমায়িত সিমেন আমদানি করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন খামারে ব্যবহার করা হয় যা দেশের গবাদি উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে ২০০৮ সাল থেকে দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এসময় কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগারের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ২০১৪ সালে রাজশাহীতে একটি আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। এই দুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বর্তমানে বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ ডোজ হিমায়িত সিমেন উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে দেশে সাভার ও রাজশাহীতে ২টি বুল ষ্টেশন কাম কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব, ২২টি জেলাকৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ৪৭৭টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৭২৫টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট চালু আছে। কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্রাক, মিল্কভিটা, আমেরিকান ডেইরি, এসিআই সহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তাদেও নিজস্ব বুল থেকে সিমেন উৎপাদন করে নির্দ্ধারিত এলাকায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজের পরিমান প্রায় ৫০% এবং দেশে সংকর জাতের গরুর সংখ্যা প্রায় ৫৫%। বিগত ১০ বছরে দেশে দুধের উৎপাদন প্রায় ৪ গুন এবং মাংস উৎপাদন ৬.৫গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ডেইরি শিল্প বিকাশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হচ্ছে-

১) ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে সারা দেশ থেকে এলিট গাভীর বুল কাফ সংগ্রহ করে কেন্দ্রিয় গো প্রজনন কেন্দ্রে পালন করত: প্রজননক্ষম হওয়ার পর সিমেন সংগ্রহ করে মাঠ পর্যায়ে দেশী ও সংকর গাভী/বকনাকে প্রজনন করিয়ে তাদের বাছুরের গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রুভেন বুল তৈরীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা ইতিমধ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২) কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বেচ্ছাসেবী কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান তৈরী করে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাভারস্থ কেন্দ্রিয় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উন্নয়ন, রাজশাহীতে ১টি আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং দেশে আরও ২টি আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব ও ৩টি বুলকাফ রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ডেইরির জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৩) মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ দেশের দুধ উৎপাদনে মহিষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মহিষের জাত উন্নয়নে বিদেশ থেকে মুররাহ্ ও নীলিরাভী জাতের সিমেন সংগ্রহ করে দেশী মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া মহিষের ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদনে সাভারে কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং টাংগাইলে মহিষের বুল কাফ রেয়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৪) প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) ঃ

এলডিডিপি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সর্ববৃহৎ একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিপুষ্টি ও প্রাণি প্রজনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ শিল্প বিকাশে প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্ন বর্নিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়ন করা হবে-

- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার স্থাপন।

- আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব স্থাপন।
- দুধ উৎপাদন এলাকায় ১৭৫টি মিল্ক কুলিং সেন্টার স্থাপন।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪১৫টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরন ইউনিট স্থাপন।
- প্রকল্প এলাকায় ৫৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা এবং প্রোডিউসার গ্রুপগুলিকে বাজার ব্যবস্থার সাথে লিংকেজ এবং মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটানো।
- ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

এ ছাড়া দেশের ডেইরি উন্নয়নে বর্তমান কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা সংশোধন এবং কৃত্রিম প্রজনন আইন প্রনয়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। আশা করা যায় উল্লেখিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যেই দেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন হবে এবং ডেইরি শিল্প অন্যতম কৃষি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

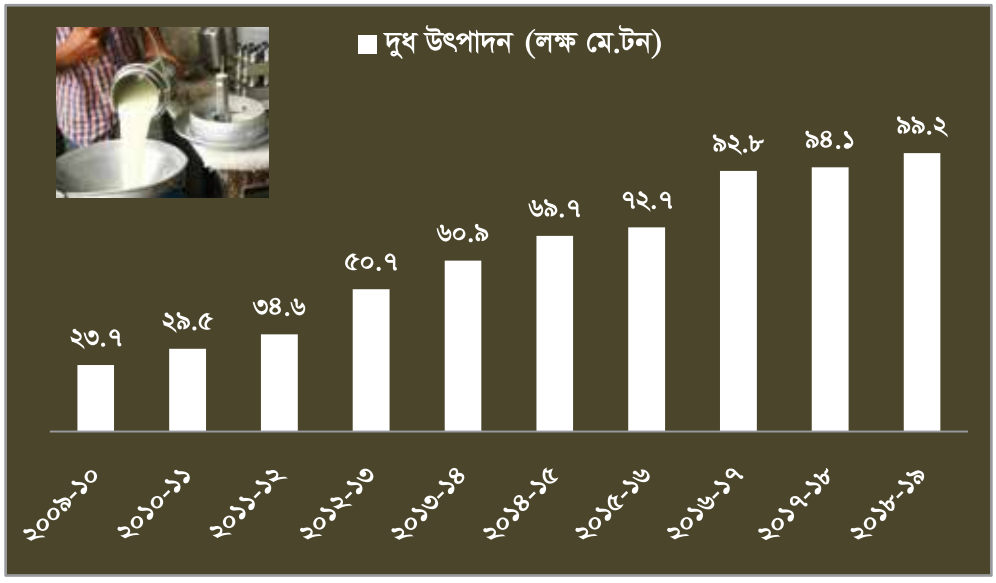

বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে দুধ উৎপাদন চিত্র

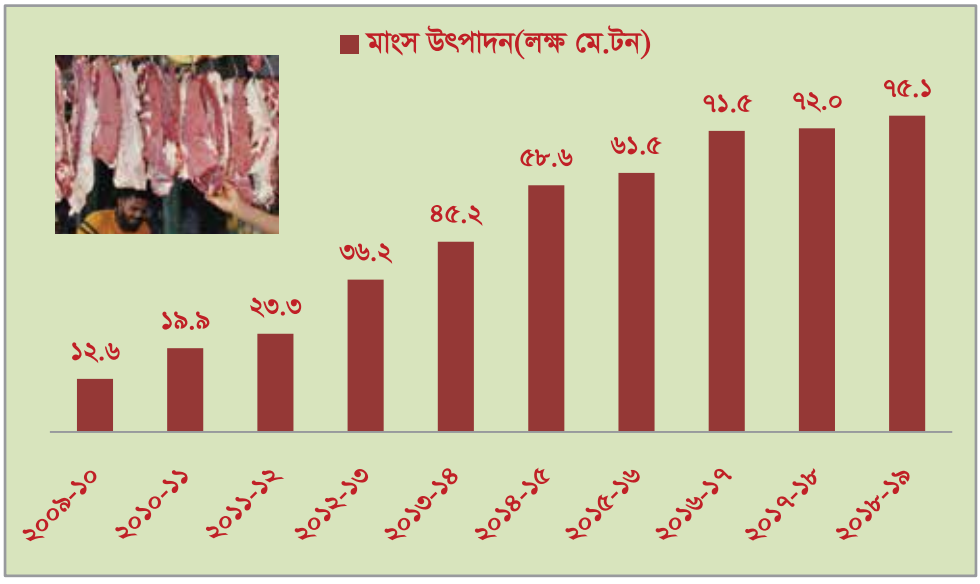

বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে মাংস উৎপাদন চিত্র

সেশন-৫

ডেইরি খামারে প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

(Animal Identification and Record Keeping in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- খামারের রেকর্ড সম্পর্কে ধারণা
- খামারে রেকর্ড রাখার সুবিধা
- প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি
- ডেইরি খামারের রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি

রেকর্ড ঃ

রেকর্ড বলতে নির্দিষ্ট তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা বুঝায়। রেকর্ড হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা উপাদানের সংরক্ষণ।

খামারের রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ প্রাণিসম্পদ ব্যবসা পরিচালনার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। কোনও লিখিত রেকর্ড না থাকলে, কৃষকদের খামার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তবে, স্মৃতিগুলি কয়েকদিন, মাস বা বছর পরে হারিয়ে যেতে পারে যা খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

খামারে রেকর্ড রাখার সুবিধা ঃ

১. অতীতের রেকর্ড থেকে প্রাণিদের মূল্যায়নের জন্য ভিত্তি তৈরি করে এবং প্রাণি নির্বাচন ও কালিংয়ে/বাছাই এ সহায়তা করে।
২. বংশবৃদ্ধি এবং পশুর ইতিহাস রেকড তৈরিতে সহায়তা করে, ট্রেসেবিলিটি পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাণি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
৩. পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি মূল্যায়ন করতে এবং পরবর্তীতে আরও ভাল প্রজনন পরিকল্পনা ডিজাইন করতে সহায়তা করে
৪. ষাঁড়ের বংশ পরীক্ষা করতে সহায়তা করে।
৫. খাদ্য সরবরাহের ব্যয় বিশ্লেষণে সহায়তা করে। সুতরাং সর্বোত্তম উৎপাদনের জন্য খাওয়ানোর কৌশলগুলি তৈরি করতে সহায়তা করে।
৬. অস্বাস্থ্যকর অবস্থা বা পশুর রোগের অবস্থা সনাক্ত করতে সহায়তা করে যা দেহের ওজন হ্রাস করে, দুধের উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির তথ্য প্রদান করে।
৭. অতীতের রোগবালাই খুঁজে পেতে এবং সময়সীমার আগে টিকা প্রদান নিশ্চিত করে।
৮. ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
৯. পশুর সামগ্রিক উন্নত তদারকি ও পরিচালনায় সহায়তা করে।
১০. দুগ্ধ খামারের আয় এবং ব্যয় (অর্থনীতি) নির্ধারণে সহায়তা করে।
১১. দুধ উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারণে সহায়তা করে।
১২. অন্যান্য খামারগুলির সাথে শ্রমের এবং পশুর দক্ষতার তুলনা করতে সহায়ক।
১৩. কখন কোন প্রাণিকে প্রজনন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে।
১৪. টিবি, ব্রুসেলোসিস সহ অন্যান্য জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সনাক্তকরণে সহায়তা করে।
১৫. প্রজনন জেনেটিক্স এবং বংশানুক্রমিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।
১৬. বার্ষিক লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং খামারের জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা/দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বছরে প্রাণির পারফরম্যান্স গুলির সাথে পারস্পরিক তুলনা করা যায়।

প্রাণি শনাক্তকরণের পদ্ধতি ঃ

১. ইয়ার ট্যাগিং (Ear Tagging) ঃ ইয়ার ট্যাগ যন্ত্রের মাধ্যমে কান ছিদ্র করে নাম্বার ট্যাগ লাগানো হয়।
২. ইয়ার টেট্টোইং (Ear Tattoing) ঃ কানে রঙ দিয়ে স্থায়ী সংখ্যা লিখা হয় যা সচারাচর ০০১ থেকে ৯৯৯ নম্বর বসানো যায়।
৩. নাম্বার ট্যাগিং (Number Tagging) ঃ গলায় চেইন পরিয়ে নির্দিষ্ট মেটালিক ট্যাগ নাম্বার লাগিয়ে দেওয়া হয়।
৪. এয়ার নোচিং (Ear Notching) ঃ কানের পাশ কেটে দিয়ে প্রাণিকে চিহ্নিত করা হয়।
৫. ব্রান্ডিং (Branding) ঃ দুধাল বাছুর কে মেটালিক নাম্বার উত্তপ্ত করে চামড়ার উপর নির্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া হয়। যা চামড়ার উপর স্থায়ী দাগ পড়ে।
৬. কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ

চিত্র-১ ইয়ার ট্যাগিং

চিত্র-২ ইয়ার টেট্টোইং

চিত্র-৩ নাম্বার ট্যাগিং

চিত্র-৪ এয়ার নোচিং

চিত্র-৫ ব্রান্ডিং

চিত্র-৬ কম্পিউটার রেকর্ডিং

আদর্শ দুগ্ধ খামারে রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

খামারে রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি দুই ধরনের-

ক) ম্যানুয়েল পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণে রেজিষ্টার ব্যবহার করা হয়। রেজিষ্টারে খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয় এবং হাতে লিখে রেজিষ্টারে নির্দিষ্ট ছকে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ) ডিজিটাল পদ্ধতি ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে খামার ব্যবস্থাপনায় Livestock Management software এর মাধ্যমে মাধ্যমে কম্পিউটারাইজড রের্কডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। Livestock Management software এমন একটিট সিস্টেম যা জন্ম থেকে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত পশুপালন রেকর্ড করতে এবং ট্র্যাক রাখতে খামার ব্যবস্থাপক বা কৃষকদের সহায়তা করে। এটি একটি প্রাণির সমস্ত ঘটনা রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রাণির জীবদ্দশায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়।

একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারে যে সকল রেকর্ড সংরক্ষণ প্রয়োজন (ম্যানুয়েল পদ্ধতি) ঃ

১. গবাদিপশুর রেকর্ড

ক্রমিক নং	গরুর বর্ণনা		গরুর লিঙ্গ	আইডি নম্বর	গরুর বয়স	গরুর নাম/ শনাক্তকরণ চিহ্ন	মন্তব্য
	জাত	প্রাপ্তিস্থান					

২. ব্রিডিং বা প্রজনন সংক্রান্ত রেকর্ড

গরুর নম্বর	ডাকে আসার তারিখ	প্রজননের তারিখ	ষাঁড়ের নম্বর/ জাত	প্রজননকারীর তথ্য		সম্ভাব্য বাচ্চা জন্মের তারিখ	মন্তব্য
				নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর		

৩. কালভিং বা বাছুরের জন্মের রেকর্ড

ক্র. নং	গাভীর নম্বর	কালভিং বা বাচ্চা জন্মের তারিখ	বাছুরের জাত	বাছুরের নম্বার	বাছুরের লিঙ্গ	জন্মের সময় বাছুরের ওজন	মন্তব্য

৪. ফিডিং রেকর্ড বা দৈনিক খাবারের হিসাব রেকর্ড

ক্র. নং	তারিখ	গবাদিপশুর আইডি নম্বর	গরু প্রতি বরাদ্দকৃত সাইলেজ/সবুজ ঘাস(কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত দানাদার খাবার (কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত অন্যান্য খাদ্য উপাদান			মন্তব্য
			গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	
মোট খাবারের পরিমাণ												

৫. প্রাণিমৃত্যু রেকর্ড

ক্রমিক নং	গবাদি পশুর আইডি নম্বর	মৃত্যুর তারিখ	মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ/লক্ষণ	লিঙ্গ	বয়স	ময়নাতদন্তের রিপোর্ট

৬. সেলস রেকর্ড

ক্রমিক নং	প্রাণির বর্ণনা				বিক্রয়ের কারণ	বিক্রয় মূল্য	বার্ষিক বিক্রয়ের তথ্য	মন্তব্য
	আইডি নম্বর	লিঙ্গ	বয়স	ওজন				

৭. ভ্যাকসিনেশন ও ডিওয়ার্মিং রেকর্ড

টিকার বিবরণ	প্রথম টিকা প্রদানের তারিখ	২য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৩য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৪র্থ বার টিকা প্রদানের তারিখ	৫ম বার টিকা প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ(FMD)						
বাদলা (BQ)						
গলা ফুলা (HS)						
তড়কা (Anthrax)						
পিপিআর (PPR)						
গোটপক্স/এলএসডি						

কৃমি নাশক	প্রথম বার	দ্বিতীয় বার	তৃতীয় বার	চতুর্থ বার	পঞ্চম বার	প্রতি তিন মাস পর পর

৮. প্রাণিস্বাস্থ্য রেকর্ড

প্রাণির নাম/আইডি/ ট্যাগ নাম্বার		চিকিৎসা তথ্য		রোগের বর্ণনা	
প্রাণির ধরণ		রোগ নির্ণয়		চিকিৎসকের নাম	
জাত/ব্রীড		চিকিৎসা		ঠিকানা	
ওজন				ফোন/ই-মেইল	
লিঙ্গ				চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও তারিখ	
বর্ণনা					
বীমা তথ্য/আইডি		ঔষধের মূল্য			

৯. দুধ উৎপাদনের রেকর্ড

দৈনিক দুধ উৎপাদন পরিমান (লিঃ)

মাসের দিন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	...	...	...	...	...	...	...	...	২৯	৩০	৩১	মোট দুধ	গড় প্রতিদিন	মন্তব্য
	বার্ষিক দুধ উৎপাদন:																							
	মোট দুধ উৎপাদনের দিন:																							

১০. জনবল রেকর্ড

ক্রমিক নং	কর্মচারীর পদবী	নিয়োগের তারিখ	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	মোবাইল নম্বর	মাসিক বেতন	মন্তব্য

১১. বার্ষিক আয় ব্যয় রেকর্ড

বার্ষিক আয়ের খাত									
ক	১	দুধ বিক্রয়							
	২	গাভী/বিক্রয়							
	৩	বাছুর/বকনা/ ষাঁড় বিক্রয়							
	৪.	গোবর সার বিক্রয়							
		বার্ষিক মোট বিক্রয়							
বার্ষিক ব্যয়ের খাত									
খ	১	বার্ষিক খাদ্য খরচ							
	২	শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন							
	৩	বিদ্যুৎ খরচ							
	৪	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা খরচ							
	৫	অন্যান্য খরচ							
		মোট খরচ							
আয় (ক) - ব্যয় (খ) = নীট লাভ									

খ) খামারে প্রাণি সনাক্তকরণ ও রেকর্ড সংরক্ষনে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে খামার ব্যবস্থাপনায় Livestock Management Software এর মাধ্যমে কম্পিউটারাইজড রের্কডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। Livestock Management Software এমন একটি সিসটেম যা জন্ম থেকে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত পশুপালন রেকর্ড সংরক্ষন করতে এবং অবস্থান ট্র্যাক করতে খামার ব্যবস্থাপক বা কৃষকদের সহায়তা করে। এটি একটি প্রাণির সমস্ত ঘটনা রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রাণির জীবদ্দশায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে গবাদিপশুর শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি গাভীর হিটে আসা, গর্ভধারণের তথ্য জানা যায়।

খামারের গবাদিপশুর রেকর্ড সংরক্ষনের বিস্তারিত তথ্যাবলীর ছক

খামার সনাক্তকরণ কোড (Tracibility Code)

বিভাগ: ----------জেলা: ----------উপজেলা: ----------খামার কোড:----------

খামার নিবন্ধন তথ্য

সরকারী নিবন্ধন নম্বর	
নিবন্ধনের তারিখ	
নিবন্ধনের মেয়াদ	

খামারের সাধারণ তথ্যবলী

খামারের নাম			
খামারের মালিকের নাম			
পিতার নাম			
মাতার নাম			
গ্রাম			
ডাকঘর			
উপজেলা			
জেলা			
মোবাইল নম্বর			
খামারের অবস্থান			
জিপিএস অবস্থান (GPS Location)			
গ্রাম/মৌজা			
ইউনিয়ন			
উপজেলা			
জেলা			
মালিকানা	নিজস্ব	ইজারা স্বল্পমেয়াদী	ভাড়া
খামারের মোট আয়তন শেড ও খালি জায়গাসহ (শতাংশ)			
শেড সমূহের সংখ্যা			
শেড সমূহের অবস্থান	উত্তর-দক্ষিণ	পূর্ব-পশ্চিম	
শেড থেকে শেডের দূরত্ব (ফুট)			
শেড সমূহের আয়তন (বর্গফুট)	১ম শেড	২য় শেড	৩য় শেড

সেশন-৬

ডেইরি প্রাণির প্রজনন ব্যবস্থাপনা

(Breeding Management in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

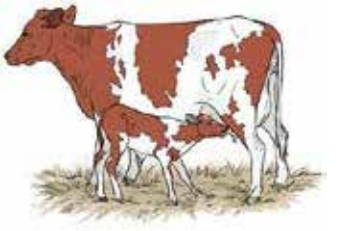

- দুগ্ধজাত গাভী বা বকনার প্রজনন ব্যবস্থাপনা
- গাভী বা বকনা প্রজননের উপযুক্ত সময়
- খামারে গর্ভধারনের হার কম বেশী হওয়ার কারন
- গাভী বা বকনার গর্ভপরীক্ষা

সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে একটি দুগ্ধ খামারের সফলতা। খামারের বকনা গরু সঠিক বয়সে প্রজননক্ষম হওয়া, সঠিক সময়ে গরম হওয়া, যথা সময়ে প্রজনন করানো এবং গর্ভধারন, গর্ভকালীন গাভী বা বকনার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঠিক রাখা, সঠিক সময়ে বাচ্চা প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী গাভী ও বাছুরের পরিচর্যা প্রভৃতি প্রজনন ব্যবস্থাপনার অর্ন্তভূক্ত। দুর্বল প্রজনন ব্যবস্থাপনার কারণে খামারের উৎপাদন দারুন ভাবে ব্যহত হয়।

বকনা বা গাভীর প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

খামারের প্রজনন ব্যবস্থাপনা শুরু হয় প্রজননক্ষম বকনা বা গাভীর সঠিক সময়ে গরম বা হিটে আসার মধ্য দিয়ে। বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র ঃ বকনা পশুর বয়:সন্ধিকাল শুরু হলে ঋতুচক্র আরম্ভ হয। যৌবনপ্রাপ্ত বকনা বা গাভীর স্বাভাবিক প্রজনন তন্ত্রের যে ধারাবাহিক জটিল বিবর্তন হয় তাকে ঋতুচক্র বা ইষ্ট্রাস চক্র বলে। ধারাবহিক এই বিবর্তন কাল বকনার জন্য ১৭-২২ দিন (গড়ে ২০দিন) এবং গাভীর জন্য ১৮-২৪ দিন (২১ দিন)। গাভীর ঋতুচক্র ৪ টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

১. প্রস্তুতি পর্ব (Proestrus) : ১-৩ দিন
২. যৌন উত্তেজনা পর্ব (Estrus): ১ দিন
৩. কামোত্তর পর্ব (Metaestrus): ১-৩ দিন
৪. নিষ্ক্রিয় পর্ব (Diestrus): ১২-১৫ দিন

প্রস্তুতি পর্ব (Proestrus) ঃ এই সময়কাল হল যৌন উত্তেজনা পর্বের (Estrus) পূর্ববর্তী পর্ব। এই সময়ে ডিম্বাশয়ে ফলিকুলার বৃদ্ধি, উচ্চমাত্রায় ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ, পূর্বের চক্রের করপাস লুটিয়ামের রিগ্রেশন ও প্রোজেসটরন হরমোন হ্রাস ঘটে।

যৌন উত্তেজনা পর্ব (Estrus) ঃ এই পর্ব হলো স্ত্রী গরুর যৌন গ্রহণযোগ্যতার সময় অর্থাৎ এই সময় স্ত্রী গরুর সাথে ষাঁড়ের মিলন হয়। এই পর্যায়ের শুরু ও শেষটি ঋতুচক্রের একমাত্র সঠিকভাবে পরিমাপযোগ্য পয়েন্ট এবং চক্রের দৈর্ঘ্য নির্ধারণের জন্য বেসলাইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাভী ছাড়া সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সময় ডিম্বক্ষরণ হয়। গাভীতে ডিম্বক্ষরণ হয় এই পর্ব শেষের ১০-১৪ ঘন্টা পর অথবা এই পর্ব শুরুর ৩০-৩২ ঘন্টা পর।

কামোত্তর পর্ব (Metaestrus) ঃ এই পর্বে ডিম্বক্ষরিত ফলিকুলের গ্রেনুলোসা কোষগুলো লুটিন কোষে পরিবর্তিত হয় এবং করপাস লুটিয়াম তৈরি হয় যা থেকে প্রোজেটেরন হরমোন নিঃসরিত হয়।

নিষ্ক্রিয় পর্ব (Diestrus) ঃ এই পর্বকে করপাস লুটিয়াম পর্বও বলা হয়। এই পর্বে করপাস লুটিয়াম পুরোপুরি কার্যকর থাকে এবং উচ্চমাত্রায় প্রোজেটেরন হরমোন নিঃসরিত হয়।

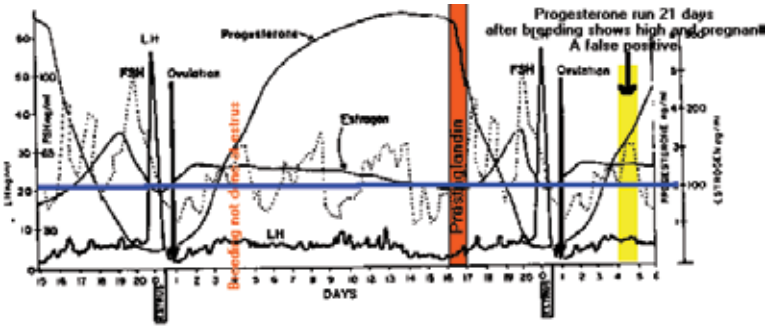

গাভী/বকনার প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) গাভীর/বকনা গরম সনাক্তকরণ (Heat Detection) এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন, কারণ একটি হিট মিস হওয়া মানে ২১ দিনের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া। সঠিক সময়ে হিট সনাক্তকরণ প্রাণির প্রজননের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন। গড় হিটের ব্যবধান ২১ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। ক্রস ব্রিড গরুতে হিটের সময়কাল ২৪ থেকে ৩৬ ঘন্টা।

বেশ কয়েকটি পদ্ধতি হিট সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কৃষক/খামারিগন কর্তৃক গাভী/বকনার আচরণগত লক্ষণ এবং শারীরিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষনের মাধমে।

প্রাথমিক গরম (Early heat)	স্থির বা উপযুক্ত গরম (Standing heat)	গরমের শেষ ভাগ (After heat)
● নার্ভাসনেস / অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় ● অন্যান্য গাভীর উপর জাম্প করে ● ভালভা ফোলা ফোলা থাকে ● অন্যান্য গরুকে চাটতে থাকে ● অন্যান্য গাভীকে শুঁকতে থাকে এবং অন্যকেও শুকতে দেয় ● খাদ্য গ্রহণ কমে যায়	● গাভী জাম্প করে দাঁড়িয়ে থাকবে ● পরিষ্কার শ্লেষ্মা/স্রাব বের হবে ● দুধ উৎপাদন হঠাৎ হ্রাস পাবে ● লেজটি ভালভা থেকে দূরে বাঁকানো থাকবে ● প্রাণি খাওয়া বন্ধ করে দিবে	● লেজে শুকনো শ্লেষ্মা থাকবে ● লেজের মাথা খসখসে হবে ● প্রাণি জাম্প করা থেকে বিরত থাকবে বা অনীহা প্রকাশ করবে। ● লালা বের হবে এবং নিজের শরীর চাটতে থাকবে।
প্রাথমিক লক্ষণ: গরুটিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	**সেরা লক্ষণ: গরুটিকে প্রজননের জন্য নিতে হবে।**	**দেরী লক্ষণ: রেকর্ড রাখতে হবে।**

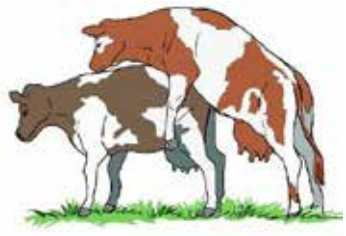

(a) Standing to be mounted : The positive sign of heat is standing to be mounted. The cow in heat stands to be mounted and does not move away

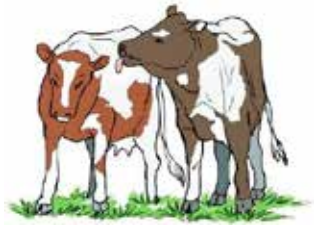

(b) Mounting head to head: The cow mounting is in heat

(c) Mounting head to head: The cow mounting is in heat

খ) ইস্ট্রাস বা হিট সনাক্তকরনের সহায়ক (Aids to oestrus detection) ঃ

১. টিজার বুল বা খোজাকরণকৃত ষাঁড় ঃ এই ষাঁড়গুলি হিটে আসা গাভীর উপর জাম্প করে কিন্ত প্রজননে অক্ষম, যে গাভী বা বকনার উপর জাম্প করবে সে গাভীটি হিটে আছে বুঝতে হবে। এ ছাড়া পুষ্টির অভাবে বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অভাবজনিত গাভীগুলি প্রকৃত হিটের লক্ষণ প্রকাশ করে না এ ক্ষেত্রে হিট সনাক্তকরনে টিজার বুল বেশী কার্যকর।

২. প্রজনন রেকর্ডস (Records) দেখে।

৩. প্রেসার সেনসেটিভ মাউন্ট ডিটেকটর ব্যবহার করে।

৪. ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন অনুভব করে।

গ) গাভী বা বকনা প্রজননের উপযুক্ত সময় ঃ

কোন গাভী বা বকনার হিট সনাক্ত করার পর প্রাণিকে প্রজনন করাতে হবে। প্রজনন দুই উপায়ে করা যায়-

ক) প্রাকৃতিক প্রজনন ঃ যা সরাসরি ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়া হয়ে থাকে।

খ) কৃত্রিম প্রজনন ঃ উপযুক্ত সময়ে প্রজনন করানো হলে গাভীর গর্ভধারনের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

নিচের গাইড অনুযায়ী গাভীকে প্রজনন করানোর উপযুক্ত সময়। এ পদ্ধতিকে এএম-পিএম পদ্ধতি বলা হয় যা গো-প্রজননে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

AM – PM Rule:	
Standing heat observed	Time for insemination
Before 9 am	Late evening the same day
Late afternoon or evening	Early next morning
Hourly guide:	

0hrs	3hrs.	6 hrs	18 hrs	24 hrs	27 hrs.
Poor	Fair	Good	Exellent	Good	Fair

Early Heat	Standing Heat	Late Heat
First Observation of standing heat		

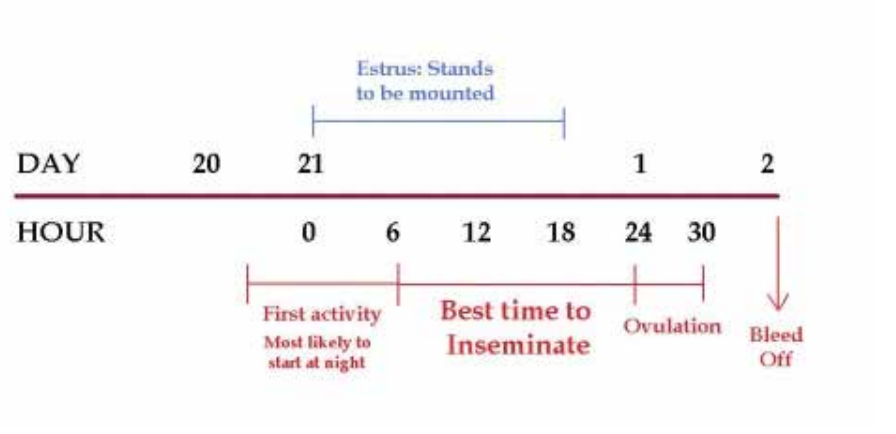

গর্ভধারনের হার কম বেশী হওয়ার কারন (Factors affecting rate of conception):

১. উর্বরতা শৃঙ্খল ঃ

সফল গর্ভধারন বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভরশীল, যা একটি উর্বরতা শৃঙ্খল বা চেইন গঠন করে। চেইনের ধারনাটি হলো এটি কেবল দুর্বলতম লিঙ্কের মতোই শক্তিশালী। সুতরাং সমস্ত লিঙ্কগুলি পুরো চেইনকে শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া উচিত, কারণ একটি দুর্বল লিঙ্কের ফলে গর্ভধারনের কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

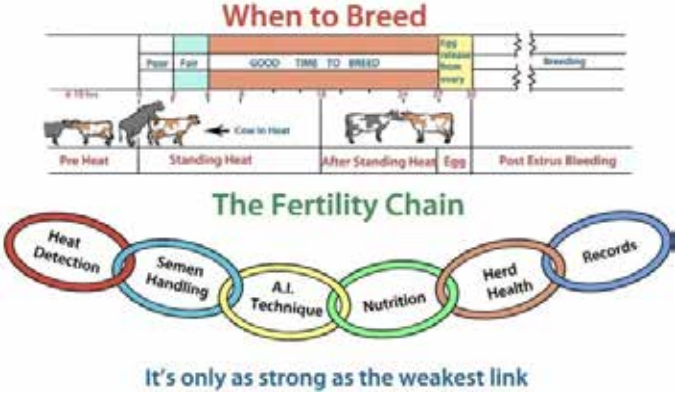

২. হিট সনাক্তকরণ এবং প্রজননের সময় ঃ

সঠিকভাবে গাভী বা বকনার হিট বা গরম চিহ্নিত করতে না পারলে বা সঠিক সময়ে প্রজনন করাতে না পারলে গর্ভধারনের হার কম হতে পারে। সাধারনত: গাভী বা বকনা গরম বা হিটে আসার ১৫ থেকে ২০ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো উচিত।

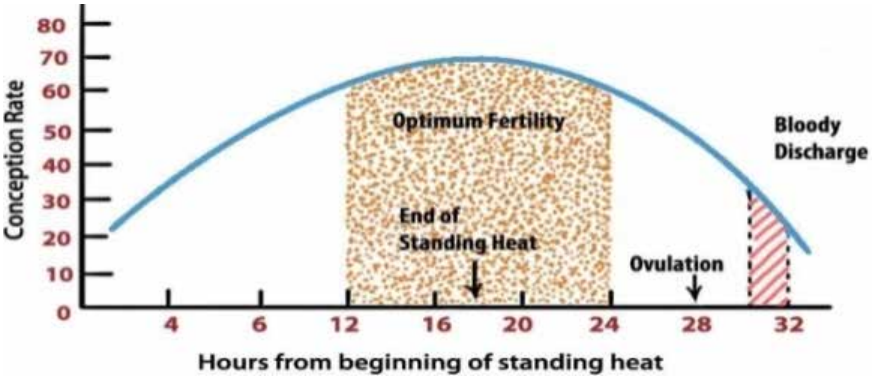

৩. সিমেনের গুণগতমান এবং ব্যবহার ঃ

খামারে ভাল মানের দুগ্ধগাভী রাখার জন্য, সর্বদা প্রমাণিত (Proven) ষাঁড়গুলির সিমেন ব্যবহার করতে হবে। সিমেন অবশ্যই রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত অথবা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের হতে হবে।

সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রজনন ষাঁড়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, না দিলে পালে প্রজনন রোগ ছড়াতে পারে। অনুমোদিত এআই কেন্দ্রের সমস্ত প্রজনন ষাঁড়গুলির স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে যাতে এগুলি থেকে সংগ্রহ করা সিমেন নিরাপদ এবং রোগমুক্ত থাকে। সিমেনের শুক্রাণুগুলি উর্বর হতে হবে, ভাল ঘনত্বের, উচ্চ গতিশীলতা এবং সাধারণ আকারের (কাঠামো) হওয়া উচিত।

৪. কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি ঃ

খামারে কেবল দক্ষ ও নিবন্ধিত ইনসেমিনেটর ব্যবহার করা উচিত যারা সঠিক এআই কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। সিমেন হ্যান্ডলিংয়ে ক্যানের মধ্যে যে তরল নাইট্রোজেন রয়েছে তার ক্ষতি না করে সিমেন ষ্ট্র বের করে সঠিক তাপমাত্রায় থোয়িং করা, এআই গানে ষ্ট্র লোড করা এবং সঠিকভাবে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রজনন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

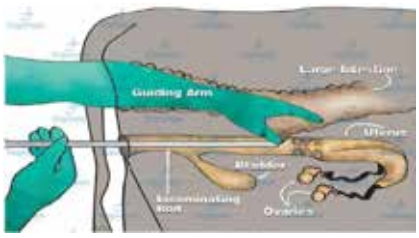

৫. পুষ্টিগত কারণ ঃ

পুষ্টি হল গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যা অন্য যে কোনও কারণের তুলনায় গরুর উর্বরতাকে প্রভাবিত করে। কম প্রোটিন এবং কম শক্তি গ্রহণের কারণে দেরীতে বয়ঃসন্ধি, নীরব হিট এবং বন্ধ্যাত্ব ডিম্বাশয়ের কারণে হয়। ভিটামিন এ এবং ডি প্রজননের ক্ষেত্রে সরাসরি জড়িত এবং তাদের ঘাটতি গর্ভাবস্থাকে প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহনের ফলে ডিম্বাশয় ফ্যাটি হয় এবং কম হরমোন নিঃসরণের ফলে গর্ভধারণের হার কম হয়।

৬. গাভীর প্রজনন অংগের স্বাস্থ্যগত অবস্থা ঃ

গরুটির সুস্বাস্থ্যের অবস্থা বজায় রাখতে হবে। গাভীর প্রজননতন্ত্রের যে কোনও রোগ গর্ভধারণের হারকে প্রভাবিত করে। জরায়ু রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে গর্ভাধারনের আগে তাকে চিকিৎসা করা উচিত।

1. Proper heat detection

2 . Proper handling of frozen semen straws

3. Proper time and technique of insemination

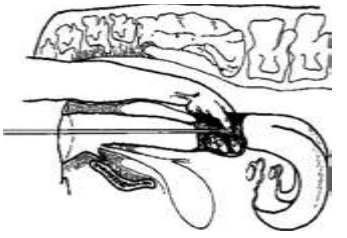

4. Proper site of semen deposition

খামারে দুধ উৎপাদন প্রভাবিত করার কারণগুলি ঃ

খামারে দুধের উৎপাদন সব সময় একই থাকে না। এক খামার থেকে অন্য খামার এবং প্রাণি থেকে প্রাণির মধ্যে দুধের উৎপাদন পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন কারনে খামারে দুধের উৎপাদন কম বেশী হয়ে থাকে।

(ক) প্রাণির কারণসমূহঃ

- ❒ কৌলিক বা বংশগত বিভিন্ন জাতের গরুর দুধ উৎপাদনের সক্ষমতা ভিন্নতর। যেমন - ফ্রিশিয়ান, আয়েরশায়ার, জার্সি, শাহিওয়াল এবং জেবু গরুর দুধ উৎপাদন ভিন্ন। এটি প্রাণির জেনেটিক মেকআপের জন্য দায়ী।
- ❒ বয়স-পরিপক্ক গাভী (>৬বছর) কম বয়স্ক গাভীর তুলনায় ২৫% বেশি দুধ উৎপাদন করে। প্রথম ল্যাকটেশনে চতুর্থ ল্যাকটেশনের চেয়ে ২৫% কম পাওয়া যায়। শীর্ষ উৎপাদনের পরে গাভীর দুধ উৎপাদন ক্রমশ: হ্রাস পায়।
- ❒ দুগ্ধদানের পর্যায়-দুগ্ধ শীর্ষ উৎপাদন প্রথম দুই মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, তারপরে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
- ❒ ইস্ট্রাস-গাভী যেদিন গরমে বা হিটে আসে তারপর দুধের উৎপাদন হ্রাস পায়।
- ❒ গর্ভাবস্থা-গর্ভাবস্থার চতুর্থ থেকে ৫ম মাসের মধ্যে, গর্ভবতী গরুগুলির মোট দুধের উৎপাদন অ-গর্ভবতী গরুর চেয়ে দ্রুত হ্রাস পায়।
- ❒ আকারে-বড় গরু একই জাতের ছোট গরুর চেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন করবে।
- ❒ রোগ-ম্যাসটাইটিস, কিটোসিস, দুগ্ধ জ্বর রোগগুলি দুধের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

(খ) পরিবেশগত কারণসমূহ ঃ

- ❒ ফিড/পুষ্টি ঃ পুষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক এবং পুষ্টি ঘাটতি, বিশেষত প্রোটিন বা শক্তি দুধের উৎপাদন কমিয়ে দেয়।
- ❒ শুকনো সময়ের দৈর্ঘ্য (Dry Cow Period) ঃ একটি সংক্ষিপ্ত শুকনো পিরিয়ড (<৬০ দিন) সাধারণত দুধের কম উৎপাদন করে। শুকানোর সময় গরুর অবস্থা-অতিরিক্ত পাতলা বা চর্বিযুক্ত গরু দুধ কম উৎপাদন করে।
- ❒ দুধ দোহনের ফ্রিকোয়েন্সি ঃ দুবার দুধ দোহনের তুলনায় দিনে ৩ বার দুধ দোহন করলে ১০-২৫% বেশি দুধ উৎপাদন হয়। ৪ বার দোহন তিন বারের চেয়ে ৫-১৫% বেশি দুধ উৎপাদন করে।
- ❒ ফার্ম লেআউট ঃ পানির পয়েন্টস, চারণভূমি, প্যাডকস এবং মিল্কিং পার্লারের মধ্যে দুরত্বেও সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দূরত্বে হাঁটা প্রাণিরা প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যয় করবে, যা দুধের উৎপাদনকে ব্যহত করবে।
- ❒ জলবায়ু ঃ উচ্চ তাপমাত্রা, দুধের উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করে। অত্যাধিক গরম প্রাণির বিশ্রাম এবং খাওয়ার উপর প্রভাব ফেলে। বিদেশী জাতগুলি স্থানীয় জাতের তুলনায় তাপমাত্রায় বেশি প্রভাবিত হয়।

গর্ভ পরীক্ষা ঃ

খামারের জন্য গাভীর গর্ভ পরীক্ষা খুবই গুরুতপূর্ন। এটি একটি উচ্চ প্রজনন দক্ষতায় পৌঁছানোর সেরা উপকরণ। প্রজনন দক্ষতা নিরীক্ষণ করতে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে গর্ভ পরীক্ষা অত্যান্ত জরুরী। গর্ভ পরীক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়।

ক) রেক্টাল পালপেশন পদ্ধতি ঃ রেক্টাল পালপেশন পদ্ধতি গবাদিপশুর গর্ভপরীক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রচলিত, সুলভ এবং কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে গর্ভধারণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে গর্ভবতী গরু সনাক্ত করা সম্ভব। এই পদ্ধতিটি জরায়ুতে বাছুরটিকে পাশাপাশি তার আকৃতি এবং রক্ত সরবরাহকারী ধমনীর অনুভব করতে দেয়। রেকটাল পাল্পেশন সাধারণত কৃত্রিম প্রজনন বা গর্ভধারণের ৮-১০ সপ্তাহ পরে করা হয়। এটি কোনও অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক বা কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান দ্বারা সম্পাদন করা উচিত।

খ) আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতি ঃ আল্ট্রাসাউন্ড গর্ভাবস্থা সনাক্ত করতে পারে পালপেশনের আগে, কখনও কখনও প্রজননের প্রথম দিকে সাধারণত ২১ দিনের পরে এটি করা হয়। এটি একটি ব্যয়বহুল এবং এর জন্য আধুনিক সরঞ্জাম এবং বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। এটি পালপেশনের চেয়ে আরও তথ্য সরবরাহ করতে পারে যেমন ভ্রুণের অবস্থা, যমজ এবং ভ্রূণের লিঙ্গ সনাক্ত ইত্যাদি।

গ) রক্ত পরীক্ষা: রক্ত এবং দুধে প্রোজেস্টেরন পরিমাপ ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রেগন্যান্সি কিটের মাধ্যমে গাভীর গর্ভ পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের অনেক দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

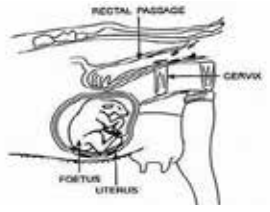

Manual Process

Rapid Test Process

Untrasonogram Process

গাভীর গর্ভধারন কাল ঃ

গর্ভধারণের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রজাতি গাভী বা বকনাতে কম বেশী হয়। গাভী বা বকনার গর্ভধারণের দৈর্ঘ্য ২৭৯ থেকে ২৮৭ দিনের মধ্যে। বেশিরভাগ জাতের জন্য সাধারণত ২৮০দিন ± ১০ দিন হয়ে থাকে। বকনা বাছুর বহনকারী গাভীর তুলনায় এঁড়ে বাছুর বহনকারী গাভীগুলির মধ্যে কিছুটা দীর্ঘ গর্ভধারণ থাকে। গর্ভকালীন সময়ে জরায়ুতে ভ্রূণ ধীরে ধীরে সোমাটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বড় হতে থাকে। গর্ভকালীন সময়য়ের শেষ পর্যায়ে গাভী প্রসবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এসময় গাভী/বকনার শরীরে ফিজিওলোজিক্যাল পরিবর্তন শুরু হয়।

কৃত্রিম প্রজনন থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ

ধাপ-১

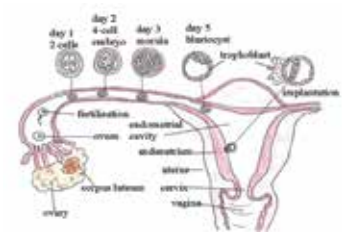

ধাপ-২

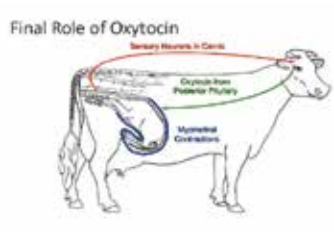

ধাপ-৩

ধাপ-৪

ধাপ-৫

ধাপ-৬

সেশন-৭

ডেইরি প্রাণির বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা

(Infertility Management in Dairy Herd)

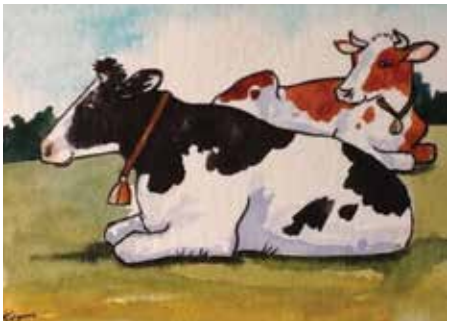

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গাভী বা বকনার বন্ধ্যাত্বের কারণ
- বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ ও প্রতিকার
- দুগ্ধ খামারের বন্ধ্যাত্ব ও উর্বরতার সূচক
- বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধে করনীয়

বন্ধ্যাত্ব হল গবাদিপশু প্রজনন কার্যক্রমে একটি অস্থায়ী ব্যাঘাত, যেখানে প্রাণি গর্ভবতী হতে পারে না। সাধারণত একটি স্বাস্থ্যকর প্রজননক্ষম গাভী প্রতি ১২-১৪ মাস পরে বাছুর প্রসব করা উচিত। বন্ধ্যাত্বের কারনে, বাছুর জন্ম এবং এবং দুধ উৎপাদন বিলম্বিত হয় যার কারণে খামার অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ে। খামারে অপরিকল্পিত পশু পালনের মাধ্যমে লোকসানের পরিমাণও বহন করে। খামারে গাভী বা বকনার বন্ধ্যাত্ব বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন: (ক) যৌনাঙ্গের রোগ (খ) সংক্রামক রোগ (গ) হিটের অনুপস্থিতি, পুনঃপ্রজনন, নীরব হিট, সিস্টিক ওভারি (ঘ) শরীর বৃত্তীয় কারণ (ঙ) ত্রুটিযুক্ত এআই প্রযুক্তি (চ) অপুষ্টি

গাভীর বন্ধ্যাত্ব ও অনুর্বরতার কারণ ঃ

একজন গাভী পালনকারীর নিকট সময়মত গাভীর গর্ভধারণ অত্যন্ত জরুরী। বাচ্চা উৎপাদনে অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা বলে। একটি গাভীতে বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যেতে পারে। যেমন-

গঠন জনিত ঃ শরীরের অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হয়। যেমন- ডিম্বাশয়, সার্ভিক্স ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা। গাভীর জমজ বাচ্চা জন্মের ফলে একটি এড়ে অন্যটি বকনা হলে সাধারনতঃ ৯১% ক্ষেত্রে বকনা বাছুরটিকে বন্ধ্যা হতে দেখা যায়, একে ইংরেজীতে ফ্রিমার্টিন বলে। অনেক পশুতে আবার অংগের কোন একটি অংশ থাকে না বা ঠিক মত বিকাশ লাভ করে না, এসব ক্ষেত্রেও পশু বন্ধ্যা হয়। ক্রোমোজম সংখ্যার তারতম্য হলেও পশু বন্ধ্যা হয়।

দূর্ঘটনা জনিতঃ প্রজনন তন্ত্রে যে কোন ধরনের আঘাতের ফলে অথবা জরায়ুর বহির্গমন, যোনির বহির্গমন (Prolapse) ইত্যাদির কারণে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হতে পারে।

শরীর বৃত্তীয় কারণঃ বিভিন্ন হরমোনের অভাব ও অনিয়মিত ক্ষরণের ফলে গাভীতে বন্ধ্যা বা অনুরবরতা দেখা দেয়। যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন, প্রোজেষ্টেরন হরমোন ইত্যাদি। এছাড়াও ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রোগ যেমন- স্থায়ী করপাস লিউটিয়াম, সিষ্ট, ফলিকুলার এট্রফি ইত্যাদি।

পুষ্টিগতঃ সুষম খাদ্যের অভাবে গাভীতে বন্ধ্যা বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন- ভিটামিন-এ, ডি, ই ও খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, কপার, কোবাল্ট ইত্যাদির অভাবে বন্ধ্যা বা অনুর্বরতা দেখা যায়। ক্যালসিয়ামের অভাবে বন্ধ্যাত্বের কোন প্রমাণ নেই তবে ফসফরাস শরীরে কাজে লাগার জন্য খাদ্যে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য। পশুর খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত ২ঃ১ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মনস্তাত্বিকঃ ভয় বা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ফলে পশুর গর্ভধারন বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষতঃ বকনার ক্ষেত্রে প্রজনন ভিতি বা অস্থিরতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার বশে এ ধরনের অনুর্বরতা দেখা যায়।

রোগ জনিতঃ বিভিন্ন সংক্রামক যৌন রোগ যেমন- ব্রসেলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিস, লেপটোসপাইরোসিস ইত্যাদি রোগ অথবা জনন তন্ত্রের অন্যান্য যেমন- মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, পায়োমেট্রা, সালফিনজাইটিস ইত্যাদি রোগে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হয়।

বংশগতঃ অনেক সময় বংশগত কারণে পশু বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন- ফ্রি-মারটিন বা হোয়াইট হেইফার ডিজিজ হলে পশু বন্ধ্যা হয়।

ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাঃ লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারনে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন অযত্ন, অবহেলা, অপর্যাপ্ত খাদ্য, অনিয়মিত দুধ দোহন, প্রসবকালীন অবহেলা, ইত্যাদি।

অন্যান্যঃ বিভিন্ন বিষয় যেমন- পশুর বয়স,ঋতু, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদি পশুর উর্বরতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতঃ ৪ বছর বয়স পর্যন্ত গাভীর উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ৬ বছর পর্যন্ত তা বিরাজ থাকে। কিন্তু ৬ বছর পর থেকে উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে। গাভী সাধারণতঃ বাড়ন্তকালে অধিক উর্বর থাকে।

দুগ্ধ খামারের বন্ধ্যাত্বের সূচক (Herd Infertility Indices) ঃ

খামারে দীর্ঘ বাচ্চা প্রসবের (Calving Interval) ব্যবধানের মাধ্যমে উর্বরতা সমস্যাগুলি প্রকাশিত হয়। উর্বরতা সমস্যা নির্দেশ করতে পারে এমন কয়েকটি শর্তের মধ্যে রয়েছে:

ইস্ট্রাসের অস্বাভাবিকতা ঃ হিটের অনুপস্থিতি, অনিয়মিত হিট, নীরব হিট, সার্বক্ষনিক হিট (nymphomania)
ভ্রুণের মৃত্য ঃ গর্ভপাত, ম্যাম্মিফাইড ফিটাস (foetus dying in uterus and becoming mummified)
প্রজনন রোগের প্রাদুর্ভাব ঃ ব্রুসেলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি।

উর্বরতার সূচক (Herd Fertility Index) ঃ

উর্বরতা ব্যবস্থাপনায় খামার সফল কিনা তা অনুমান করার জন্য, নিম্নলিখিত সূচকগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক) বাচ্চা প্রসবের ব্যবধান (Calving Interval) ঃ

একটি দক্ষ প্রজনন কর্মসূচী একটি খামারের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে যা একটি গাভীর সারাজীবনে বাছুর প্রসবের সংখ্যা এবং তার মোট দুধ উৎপাদন। সফল প্রজননের একটি ভাল সূচক হল এক বছরে একটি কালভিং বা বাচ্চা প্রদান।

খ) গর্ভধারনের হার ঃ

- প্রথম পরিসেবার পরে - ৭০%
- দ্বিতীয় পরিসেবা পরে - ৮০%
- তৃতীয় পরিসেবা পরে - ৯০% এর উপরে

যদি উর্বরতা শৃঙ্খলে সমস্ত উপাদান বিবেচনা করা হয়ে থাকে তবে ৩ টি প্রজননের পরেও গর্ভধারণ না করা তবে গাভীগুলি ছাটাই করা উচিত।

গ) খামারে প্রত্যাশিত প্রাণি চয়ন ঃ

- দুধের গাভী- ৪৫%
- শুষ্ক গরু- ৯%
- গর্ভবতী বকনা- ৮%
- বকনা (দুধ ছাড়ানো থেকে প্রথম প্রজনন) ১৪%
- বকনা (জন্ম থেকে দুধ ছাড়ানো) ২৪%

গাভী / বকনার বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতার লক্ষণ ঃ

- গাভী বাচ্চা প্রসবের ৯০-১০০ দিনের মধ্যেও গরম হয় না।
- সব সময় গরম থাকে বা অনিয়মিতভাবে গরম হয়।
- ১৫ দিনের কম সময় বা ২৮ দিনের বেশী সময় পর পর গরম হয়।
- দীর্ঘদিন অর্থাৎ গাভী এক বছর বা অধিক সময় গরম না হওয়া।
- স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে ঘোলা, পুজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হওয়া।
- গর্ভপাত হওয়া।
- তিন বারের অধিক প্রজননের পরও গর্ভধারণ না করা।
- গর্ভফুল না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন ইত্যাদি।

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা প্রতিকারের উপায়ঃ

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও কচি ঘাস খাওয়াতে হবে।
- সঠিকভাবে গাভীর গরমকাল নির্দ্ধারণ করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- প্রজনন তন্ত্রের কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রসবের সময় সঠিক যত্ন নিতে হবে।

গাভী বা বকনার বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধে করনীয় ঃ

- ❑ হিটের উপযুক্ত সময়ে প্রজনন করাতে হবে। গর্ভধারণের জন্য দীর্ঘায়িত হিটের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি এআই প্রয়োজন হতে পারে।
- ❑ নিরব হিট সনাক্ত করতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- ❑ বাছুর জন্মের পর থেকেই সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। খনিজ মিশ্রণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।
- ❑ সর্বদা পরিষ্কার পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত ছায়া বা শীতল ব্যবস্থা সরবরাহ করে প্রাণির হিট ট্রেস কমাতে হবে।
- ❑ এআই পরিসেবা প্রদানকারী কর্মীরা পর্যাপ্ত যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।
- ❑ প্রাণি পর পর ৩ বার প্রজননের পরেও গর্ভধারণ না করে থাকলে অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বারবার প্রজনন, প্রজনন অঙ্গগুলির স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সাথে গাভীগুলি গর্ভধারণ নাও করতে পারে।
- ❑ সংক্রমণ বা প্রজনন অংগের রোগগুলিও বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে। সঠিক পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সেশন-৮

প্রজেনি টেস্টিং ও জেনোমিক পদ্ধতিতে প্রজনন ষাঁড় বাছুর নির্বাচন

Breeding Bull Calf Selection Through Progeny Testing and Zenomic Process

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রজেনি টেস্টিংএর উদ্দেশ্য
- প্রজেনি টেস্টিং এর ধাপসমুহ
- জেনোমিক পদ্ধতিতে ষাঁড় বাছুর নির্বাচন

প্রজেনি টেস্টিং একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল যা নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট জাতের দুধের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রজেনি টেস্টিং এর তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে:
১) এআই সায়ার নির্বাচনের সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য সরবরাহ করা ।
২) কার্যকর জেনেটিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা একটি সমালোচনামূলক ভর সরবরাহ এবং
৩) বিস্তৃত স্কেলে এআই ব্যবহারের জন্য সঠিক মূল্যায়নের সাথে এআই ষাঁড়গুলি বিকাশ করা।
প্রজেনি টেস্টিং পরীক্ষার মূল লক্ষ্য হল সায়ার সূচকগুলির ভিত্তিতে প্রজনন ষাঁড়গুলি তাদের কন্যাগুলিকে একক / একাধিক পশুর ৩০৫ দিনের দুধের উৎপাদন ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা। বংশ পরম্পরায় টেস্টিং প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত কৌশল জড়িত-

$$\text{Sire Index} = m + \frac{2n}{n+12}(D - CD)$$

যেখানে, m = সামগ্রিক গড় ৩০৫ দিনের প্রথম ল্যাকটেশনের কন্যার দুধের উৎপাদন, n = কন্যার সংখ্যা। D = কন্যাগুলি গড়ে ৩০৫ দিন প্রথম ল্যাকটেশনে দুধের উৎপাদন এবং CD = সমকালীন কন্যারা (একক বা একাধিক প্রাণিরও বেশি) গড়ে ৩০৫ দিন প্রথম ল্যাকটেশনে দুধের ফলন।

সমস্ত সায়ার তাদের সায়ার ইনডেক্সের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্ক করা হয় যার মধ্যে ২০-৩০% শীর্ষ র‍্যাঙ্কিং ষাঁড়গুলি ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য (উন্নত সিমেন উৎপাদনের জন্য) প্রমাণিত ষাঁড় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

প্রজেনি টেস্টিং এর ধাপসমুহ ঃ

পদক্ষেপ ১: প্রজেনি টেস্টিং জন্য নির্বাচিত এলাকাগুলিতে সেরা উৎপাদনশীল গাভী (এলিট গাভী) সনাক্ত করা যায় এবং প্রজেনি টেস্টিং এর জন্য নির্বাচিত ষাঁড় এর সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো হয়।

পদক্ষেপ ২: এলিট গাভীতে জন্ম নেওয়া এঁড়ে বাছুরগুলি উন্নত ব্যবস্থাপনায় ৫-৬ মাস লালন পালন করে শারীরিক পরীক্ষায় উর্ত্তীন হওয়ার পরে কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

পদক্ষেপ ৩: নির্বাচিত এঁড়ে বাছুরগুলি গো প্রজনন কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। ব্রিডিং স্টেশন এ নির্বাচিত ষাঁড় বাছুরগুলিকে প্রয়োজনীয় সুষম খাবার সরবরাহ ও উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করা হয় এ সময় বাছুরগুলির নেতিবাচক দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পদক্ষেপ ৪: প্রজননক্ষম হওয়ার পর নির্বাচিত ষাঁড়গুলি থেকে সিমেন সংগ্রহ ও ল্যাবরেটরিতে মান পরীক্ষা করা হয় এবং ত্রুটিমুক্ত সিমেন প্রজেনি টেস্টিং অঞ্চলে একই জাতের গাভীগুলির বৃহৎ গোষ্ঠীতে ব্যবহার করা হয়।

পদক্ষেপ ৫: নির্বাচিত ষাঁড়ের (Testing bull) পরীক্ষার জন্য জন্ম নেওয়া বকনাদের দুধের উৎপাদন রেকর্ড করা হয়। ষাঁড়ের জেনেটিক গুনাগুন পরীক্ষার জন্য সর্বনিম্ন ১০০ বকনা গাভীর সম্পূর্ণ প্রথম ল্যাকটেশনের উৎপাদন রেকর্ড করা প্রয়োজন।

পদক্ষেপ-৬: বকনাদের বৈশিষ্ট্যের (Performance) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পরীক্ষা ষাঁড়ের (Testing bull) এর প্রজনন মান (Breeding Value) অনুমান করা হয়। ল্যাকটেশনের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে শীর্ষ ১০% বকনা বাছাই করা হয়।

পদক্ষেপ-৭: শীর্ষ ১০% বকনা (ল্যাকটেশন রেকর্ডের ভিত্তিতে) এবং নির্বাচিত ষাঁড়গুলির শীর্ষ ১০% (প্রজনন মানের উপর ভিত্তি করে) পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ ষাঁড় (Prooven bull) উৎপাদন করতে ব্যবহৃত হয়। প্রজেনি টেস্টিং-এর প্রতিটি চক্র সম্পূর্ণ হতে ৬-৭ বছর সময় নেয়। এটি সর্বদা নিশ্চিত করা হয় যে প্রক্রিয়াটিতে কোনও প্রজনন সমস্যা নেই।

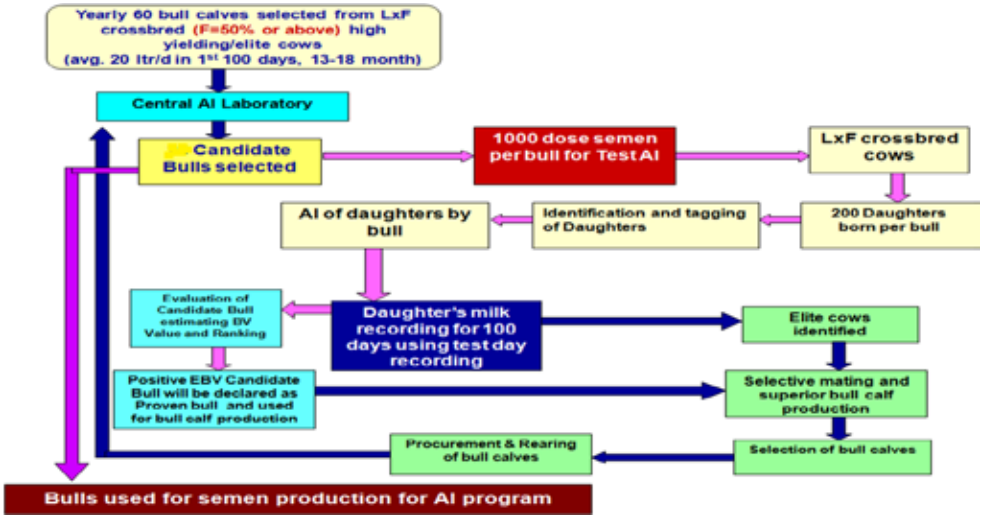

জেনোমিক পদ্ধতিতে ষাঁড় বাছুর নির্বাচন (Genomic Selection Process of Breeding Bull Calf) ঃ

বর্তমানে, কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহারের জন্য ডেইরি সায়ার নির্বাচন প্রজেনী টেষ্টিং পদ্ধতির পরিবর্তে জেনোমিক নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা বাছুরের স্বাস্থ্য, দুধ উৎপাদন এবং উর্বরতার জিনোমিক পূর্বাভাসের উপর নির্ভরশীল। জিনোমিক নির্বাচনের মাধ্যমে, ভবিষ্যতের সায়ার (পরবর্তী প্রজন্মের) এর পিতা এবং মাতাটি ডিএনএ চিহ্নিতকারী প্রোফাইলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় এবং প্রজননক্ষম হওয়ার পরেই তাদের মধ্যে প্রজনন করানো হয়। পরবর্তী প্রজন্মের সায়ার জন্মের পরেই আকাঙ্ক্ষিত এবং অযাচিত বৈশিষ্ট্যের জন্য মার্কার-বিশ্লেষণ করা হয়। এটি এআই সংস্থাগুলিকে প্রথাগত প্রজেনী টেষ্টিং কর্মসূচির মাধ্যমে কয়েক হাজার ষাঁড়ের পরিবর্তে হাজারে দশটি ষাঁড় পরীক্ষা করতে সহায়তা করে। অধিকন্তু, প্রজেনী পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষা না করে, তাৎক্ষনিক অনেকগুলি ষাঁড় সায়ার ফাদার হিসাবে জিনোমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে বিপণন করা হয় (স্যাটারলার, ২০১৩)।

জেনোমিক নির্বাচন পদ্ধতি দুগ্ধজাত প্রাণির প্রজননকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ২০০০ সাল থেকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে প্রচুর সংখ্যক একক নিউক্লিওটাইড পলিমারফিজমস (এসএনপি) জিনোটাইপ (single-nucleotide polymorphisms-SNPs) তৈরী করার জন্য অ্যাসেস তৈরি করা হয়েছে। আমেরিকায় প্রথম বাণিজ্যিক এসএনপি জিনোটাইপিং চিপটি ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে বের করা হয়। আমেরিকায় ডেইরি জিনোমিক মূল্যায়নে কোন এসএনপি ব্যবহার করা উচিত তা নির্ধারণ করতে ১৫,০০০ এরও বেশি জিনোটাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। অফিশিয়াল USDA জানুয়ারী ২০০৯ সালে প্রথম হলস্টাইনস এবং জার্সির জন্য জিনোমিক মূল্যায়ন প্রকাশ করে। ব্রিডার বিশেষজ্ঞগন ষাঁড়ের চূড়ান্ত কন্যা-ভিত্তিক মূল্যায়নের সঠিক ইঙ্গিত হিসাবে জিনোমিক মূল্যায়নগুলি গ্রহণ করেছেন। জেনোমিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ডিএনএ চিহ্নিতকারী প্রযুক্তি জেনেটিক অগ্রগতির হারকে দ্বিগুণ করেছে, প্রজন্মের ব্যবধান হ্রাস করেছে, নির্বাচনের যথাযথতা বৃদ্ধি করেছে। জেনোমিক মার্কার ব্যবহার প্রজন্মের ব্যবধানকে হ্রাস করেছে, তাদের সন্তানদের জন্মের সময় তাদের পিতামাতার গড় বয়স হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ষাঁড়ের সায়ার (পিতা) উৎপাদন ব্যবধানটি প্রায় ৭ থেকে ২.৫ বছর কমে গেছে, ষাঁড়ের ড্যাম (মাতা) গুলি ৪ থেকে ২.৫ বছরে হ্রাস পেয়েছে। জেনোমিক নির্বাচন কন্যা গর্ভাবস্থার হার (daughter pregnancy rate-DPR), উৎপাদনশীল জীবন (productive life-PL) এবং সোম্যাটিক সেল স্কোরের মতো অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উন্নতির হার বৃদ্ধি করেছে।

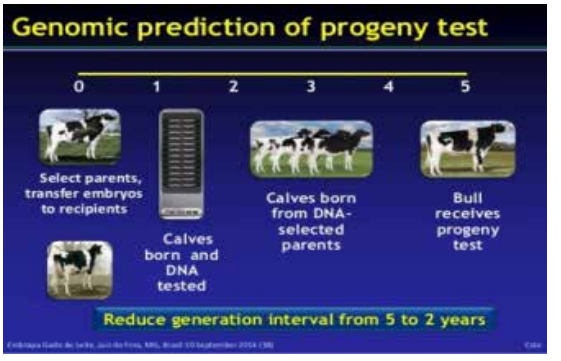

সেশন-৯

ডেইরি প্রাণিতে ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি এবং সেক্সড সিমেন এর ব্যবহার

(Use of Embryo Transfer Technology & Sexed Semen in Dairy Herd)

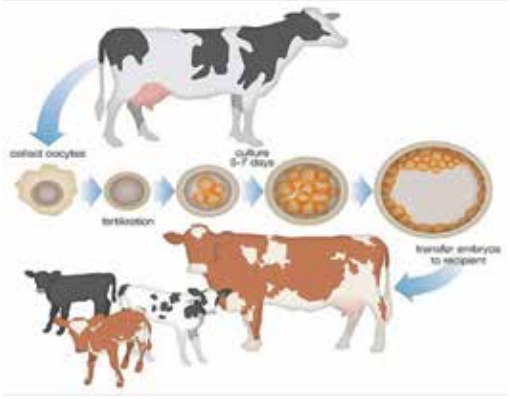

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি ও এর উপকারিতা
- ভ্রূণ স্থানান্তর প্রক্রিয়া
- এমওইটি বা ময়েট প্রক্রিয়া
- সেক্সড সিমেন সর্ম্পকে ধারণা ও ব্যবহার
- উর্বরতার উপর সেক্সড সিমেনের প্রভাব

ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি ঃ

ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি (ইটিটি) এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে ভ্রূণ দাতা স্ত্রী প্রাণি (donor female) থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং গ্রহীতা প্রাণি (recipient females) গুলিতে স্থানান্তর করা হয়, যা গর্ভাবস্থার বাকি অংশগুলির জন্য প্রতিনিধি মায়েদের (surrogate mothers) ভূমিকা পালন করে। এটি প্রজনন বায়োটেকনোলজির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যেখানে পুরুষ ও স্ত্রী জেনেটিক উপাদানগুলি গবাদিপশুদের দ্রুত উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়। উচ্চতর জিনগত যোগ্যতা সহ দেশীয় গাভী ভ্রূণগুলি প্রতিনিধি গাভী (surrogate mothers) তে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। এটি একটি বৈপ্লবিক প্রজনন কৌশল যা গবাদিপশুর দ্রুত জিনগত উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির উপকারিতা-

ভ্রূণের স্থানান্তর প্রযুক্তি (ইটিটি) গরুর দুধের উৎপাদনশীলতায় তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুগ্ধ খামারগুলিকে অত্যন্ত লাভজনক করে তুলতে পারে। ইটিটি-র মাধ্যমে উৎপাদিত স্থানীয় জাতের গাভী থেকে প্রতিদিন ১০-১৫ লিটারের মধ্যে, এফ-১ ক্রস ব্রেডের গাভী থেকে ২০-৩০ লিটার এবং বিদেশী উন্নত জাতের গাভী থেকে ৩০ লিটারেরও বেশি দুধের উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

১. এই প্রযুক্তি খামারি/কৃষকদের জন্য সহজলভ্য।
২. এর ফলে দেশীয় গবাদিপশুগুলিকে দ্রুত উচ্চ মানের জিনগত যোগ্যতাসম্পন্ন গবাদিপশু উৎপাদনে সহায়ক হবে।
৩. একজন খামারি/কৃষক উচ্চ জেনেটিক যোগ্যতা সম্পন্ন পাঁচ থেকে ছয় গুণ বংশধর পেতে পারেন।
৪. এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত বাছুরগুলি রোগমুক্ত থাকবে।
৫. জমজ বাচ্চা উৎপাদন করা যাবে।

গবাদিপশুতে সফলভাবে ভ্রূণ স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয় ঃ

- দাতা স্ত্রী গরু (donor cow) নির্বাচন
- উচ্চ উর্বর সিমেন ক্রয়/সংগ্রহ
- দাতা গাভীর ইস্ট্রাস চক্রের শুরুর ৯-১৪ দিনের মধ্যে সুপারওভুলেটরি ঔষধ ইনজেকশন
- প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীলতা
- দাতা এবং গ্রহিতা প্রাণিগুলিতে ইস্ট্রাস সনাক্তকরণ
- গর্ভাধানের সঠিক সময়, সিমেনের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতার সাথে কৃত্রিম প্রজনন কৌশল প্রয়োগ
- প্রতিটি দাতার কাছ থেকে সর্বাধিক ভ্রূণের পুনরুদ্ধার বা সংগ্রহ
- ভ্রূণের পৃথকীকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাস
- সংগ্রহ এবং স্থানান্তরের মধ্যে ভ্রূণের সঞ্চয়
- যথাযথ ক্রাওপ্রিজারভেশন পদ্ধতি
- গ্রহিতার কাছে ভ্রূণের স্থানান্তর
- একটি নির্দিষ্ট দাতার কাছ থেকে ভ্রূণের অভ্যন্তরীণ কার্যকরতা
- উর্বর গ্রহিতাদের নির্বাচন
- গর্ভ নির্ণয়, প্রায় ৫০ দিন পরে (পালপেশান পদ্ধতিতে)

- গর্ভপাত প্রতিরোধ
- বাচ্চা প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা
- বাছুরের ভাল পরিচর্যা
- দাতা, গ্রহিতা এবং বাছুরের পুষ্টি
- রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং টিকা প্রদান
- আবহাওয়া
- সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ

গবাদিপশুতে সফলভাবে ভ্রুণ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ ঃ

১। দাতা স্ত্রী গরু (donor cow) ও গ্রহীতা স্ত্রী গরুর (recipient cow) ইস্ট্রাস সিনক্রোনাজেশন
২। দাতা স্ত্রী গরুকে সুপারওভুলেটরি ঔষধ ইনজেকশন (যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, পিএমএসজি)
৩। উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা দাতা স্ত্রী গরুকে কৃত্রিম প্রজনন
৪। দাতা স্ত্রী গরু থেকে ভ্রূণের পুনরুদ্ধার বা সংগ্রহ এবং ভ্রূণের পৃথকীকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস
৫। সিনক্রোনাইজড গ্রহিতা স্ত্রী গরুতে ভালো ভ্রুণ স্থানান্তর
৬। অব্যবহৃত ভ্রুণসমূহ ভবিষ্যতে স্থানান্তরের জন্য ক্রাওপ্রিজারব করে সংরক্ষণ

ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদনে সাফল্যের হার পরিবর্তনের কারন ঃ

- নির্দিষ্ট ষাঁড় থেকে হিমায়িত সিমেনের চেয়ে তরল সিমেন বেশী কার্যকর।
- হিমায়িত ভ্রূণের ফলে গর্ভধারণের হার কম হতে পারে।
- ভ্রুন স্থানান্তরে অদক্ষতার কারনে গর্ভধারনের হার কম হতে পারে।
- অল্প বয়স্ক বকনা বয়স্ক গাভীর চেয়ে দাতা এবং গ্রহিতা বেশি উর্বর হতে পারে।
- কিছু দাতাদের তৃতীয় বা চতুর্থ সুপারভোলিউশনের পরে সাফল্যের হার হ্রাস পায়।

ভ্রুন স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি ঃ

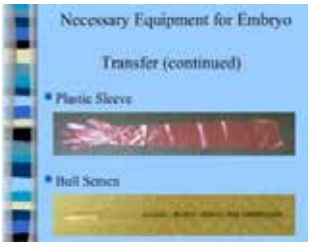

Multiple Ovulation and embryo transfer (MOET)-

এমওইটি (MOET) বা ময়েট (একাধিক ডিম্বস্ফোটন এবং ভ্রুণ স্থানান্তর) প্রাণি প্রজননের একটি আধুনিক পদ্ধতি, যা প্রাণি উৎপাদন বাড়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ময়েট হলো এমন একটি পদ্ধতি বা টেকনোলজি যেখানে উন্নত জাতের দাতা গাভী থেকে নিষিক্ত ডিম্বানুগুলি অপসারণ বা সংগ্রহ করে যারা জেনেটিকভাবে সম্পর্কিত নয় এমন একাধিক গ্রহিতা বা সারোগেট গাভীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদনের প্রক্রিয়া। এই কৌশলটি বিভিন্ন গবাদি পশু যেমন- গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ ও শুকর ইত্যাদি প্রাণিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়না, কারণ ঘোড়িকে সুপার ওভুলেটেড করা যায়না।

এমওইটি বা ময়েট সেরা প্রাণিদের জিনগত সম্ভাবনাকে বাড়ানোর একটি উত্তম পদ্ধতি। সাধারণত একটি গাভী বছরে একটি বাছুর উৎপাদন করে। তবে এমওইটি বা ময়েট ব্যবহারের মাধ্যমে জিনগতভাবে ফিট একটি গাভী থেকে একাধিক বাছুর উৎপাদন সম্ভব। ময়েট প্রক্রিয়াতে, হরমোন বিশেষত ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন ব্যবহার করে গাভীর একাধিক ডিম্বস্ফোটন প্ররোচিত করার জন্য সাইক্লিং গাভীদের ডিম্বাশয়কে উদ্দীপিত করা হয়। সুপারওভুলেটেড গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয় এবং গাভীর জননতন্ত্রে একাধিক ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। ৭-৮দিন পর, ভ্রুণগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং একাধিক গ্রহিতা গাভীতে স্থানান্তর করা হয়। অব্যবহৃত ভ্রুণগুলি

পরে স্থানান্তর করার জন্য হিমায়িত করে ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ করা হয়।
১। স্বাভাবিক প্রজননের তুলনায়, এই প্রক্রিয়ায় জেনেটিক্যালি সুপেরিয়র উন্নত জাতের দাতা গাভী থেকে অনেকগুলি উন্নত জাতের এঁড়ে ও বকনা উভয় জাতের বাছুর উৎপাদন সম্ভব।
২। উন্নত জাতের গাভীর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং একই সাথে দলগত বা পালের জাতের উন্নতির হার বৃদ্ধি করে।
৩। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
৪। জমজ বাছুর উৎপাদন সম্ভব।
৫। ষাঁড়ের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ত্রুটিগুলি পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।
৬। রোগ, আঘাত এবং বার্ধক্যের কারণে বন্ধ্যা গাভীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ ময়েট বা এমওইটি পদ্ধটির মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থার হার বৃদ্ধি তথা এই কৌশলটির সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- পুষ্টি, দাতা ও গ্রহিতা গাভীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা, ঋতুচক্রের পর্যায়, ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোনের সংবেদন, ডিম্বাশয়ে ফলিকুল সংখ্যা, স্ট্রেস, ষাঁড়ের প্রভাব ইত্যাদি।

এমওইটি বা ময়েট প্রক্রিয়া ঃ (চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো)

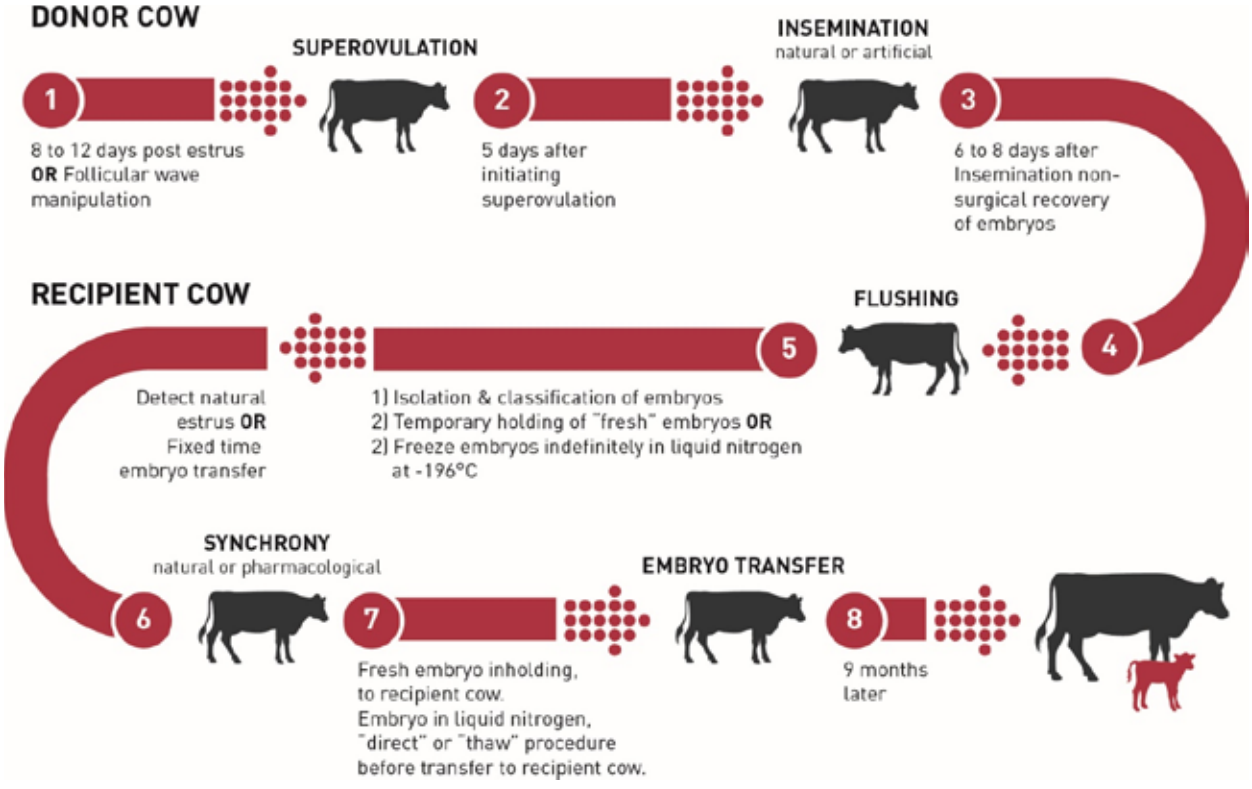

ডেইরি প্রাণিতে সেক্সড সিমেনের ব্যবহার

সেক্সড সিমেন কী?

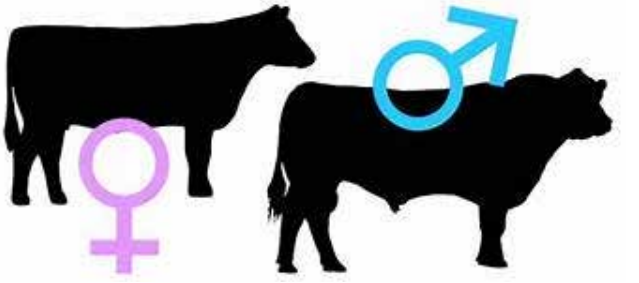

সেক্সড সিমেন হচ্ছে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত ষাঁড়ের বীর্য যা থেকে শুক্রাণু কোষগুলির 'Y' ক্রোমোজোম - যা পুরুষ বাছুরের জন্ম দেয়। বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'Y' ক্রোমোজোমগুলি সিমেন থেকে সরানো হয় বা মেরে ফেলা করা হয়। সেক্সড সিমেনে মাত্র 'X' ক্রোমোজোম থাকে যা শুধু বকনা বাছুরের জন্ম দেয়।

উন্নত বিশ্বে দুগ্ধজাত গবাদিপশুর ব্যবস্থাপনা, বিকাশ এবং বৃদ্ধির জন্য সেক্সড সিমেন একটি বড় সংস্থান হয়ে উঠেছে। এই সেক্সিং প্রযুক্তি স্ত্রী এবং পুরুষ ডেইরি প্রাণিদের মধ্যে মেটিং প্ল্যান করার পাশাপাশি খামারে প্রাণির পুনর্নবীকরণের নতুন উপায় বা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যাইহোক, এই সিমেনটি বিভিন্ন পদ্ধতি ও দক্ষতার মাধ্যমে তৈরী করা হয় তাই এটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই ভংগুর এবং মূল্যবান। তবুও, কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে সাফল্যের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করা সম্ভব।

সেক্সড সিমেন হল সাম্প্রতিক উন্নত প্রযুক্তির ফল। এটি সহজ এবং তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য, যদি কেউ উচ্চ মানের সিমেন নিয়ে সাবধানতার সাথে কাজ করে। ২০১৩ সালে ফরাসী ইনস্টিটিউট অফ লাইভস্টক-এর একটি সমীক্ষা জানিয়েছে যে সেক্সড সিমেন ব্যবহারের ফলে স্ত্রী বাছুর গঠনের পক্ষে ৯০% এর কাছাকাছি লিঙ্গ অনুপাত অর্জন সম্ভব হতে পারে।

খামারিদের জন্য সেক্সড সিমেন ব্যবহারের সুবিধা ঃ

যে সব খামারি তাদের খামারের গবাদিপশুর পুনর্নবীকরণের জন্য সর্বাধিক জেনেটিক সুবিধা লাভ করতে চান এবং প্রধানত: কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে তাদের গাভীর গর্ভধারণ পছন্দ করেন; তারা তাদের খামারের প্রিমিয়াম বংশের (গাভী এবং বকনা) জন্য ৫০-৭০% গাভীতে সেক্সড সিমেন ব্যবহার করবে।

তাদের গোষ্ঠীর বাকী অংশের (৩০-৫০%), পুরুষ সেক্সড সিমেন ব্যবহার তাদের খামারের হাইব্রিড এঁড়ে বাছুরের বংশবৃদ্ধির জন্য যা বিক্রির মাধ্যমে সর্বাধিক মূল্য প্রাপ্ত হয়।

সেক্সড সিমেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে ঃ-

১) গাভী পুন:রুৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।
২) বকনা বা গাভীর বয়স কম হতে হবে।
৩) প্রজননকৃত গাভী-বকনাকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৪) গাভীর প্রজনন কক্ষ বা সেড পরিষ্কার, জীবানুমুক্ত হতে হবে।

উর্বরতার উপর সেক্সড সিমেনের প্রভাব ঃ

যদি কোনও নির্দিষ্ট পশুর মধ্যে বকনাদের প্রথম প্রজননে গর্ভধারণের হারটি সাধারণত ৭০ শতাংশ হয় তবে সেক্সড সিমেন বা Gender Enhanced Semen (GES) এর প্রত্যাশিত গর্ভধারণের হার ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ হয়; যদি স্বাভাবিক ধারণার হার ৬০ শতাংশ হয় তবে সেক্সড সিমেন এ ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ আশা করা যায়।

নিম্নে গ্রাফের সাহায্যে বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন বকনার সেক্সড সিমেন ব্যবহারে কৃত্রিম প্রজননের সফলতার হার দেখানো হলো-

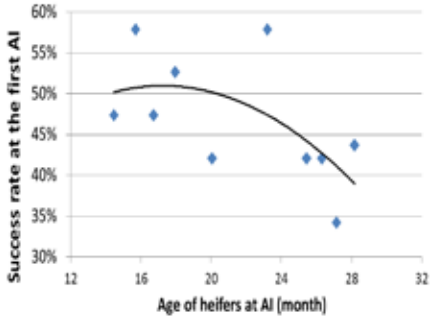

Fig.1: Artificial insemination rate (in percentages) depending on the animal's age using sexed semen

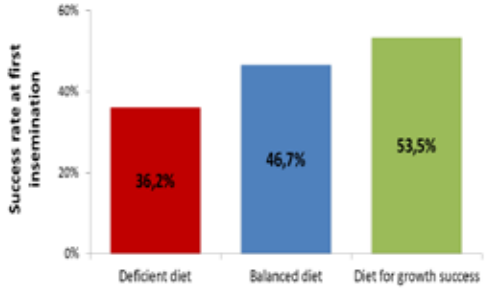

Fig. 2: Artificial insemination rate depending on the cow's dietary level using sexed semen

সেক্সড সিমেন একটি পরিশীলিত প্রযুক্তির ফলাফল যা নিয়মিত সিমেনের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত গেমেট নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, আসলে, X ক্রোমোজোম বহনকারী স্ত্রী গেমেট পুরুষ গেমেটের চেয়ে ৪% বেশি ভারী। সুতরাং, প্রতিটি শুক্রাণু ভর প্রায় ৯০% নির্ভুলতা সঙ্গে পরীক্ষাগারে নির্বাচনের মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে। তবে, এই পুরো ম্যানিপুলেশন প্রক্রিয়াটি শুক্রাণুগুলিকে দুর্বল করে তোলে। এজন্য প্রাণিদের বিকাশের জন্য উপযুক্ত শক্তি ও পুষ্টি সরবরাহ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরী যাতে শুক্রাণুগুলির জীবন দীর্ঘায়িত হতে পারে। এই সিমেন সংরক্ষণ তাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সেক্সড সিমেন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল-

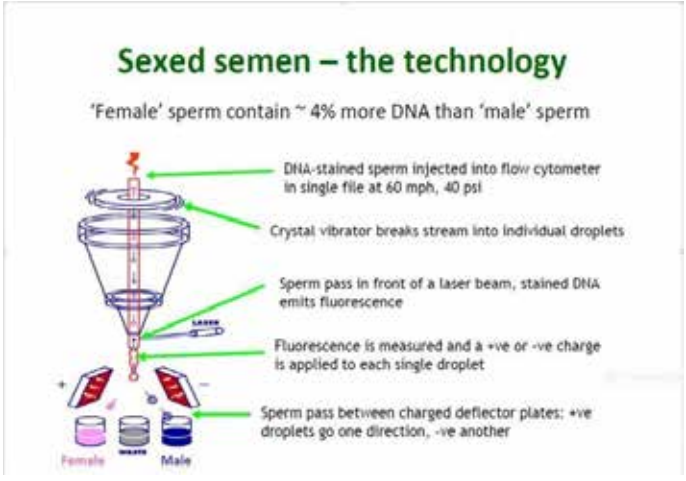

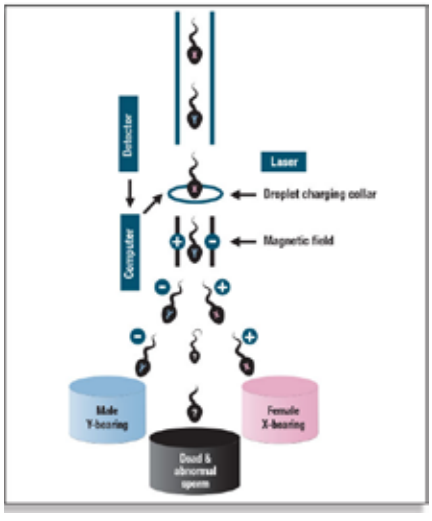

সেশন-১০

ডেইরি প্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

(Feeding Management in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ডেইরি প্রাণির খাদ্য সরবরাহ
- ডেইরি প্রাণির সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত
- ডেইরি প্রাণির আঁশ ও দানাদার জাতীয় খাদ্য উপকরন পরিচিতি
- ডেইরি প্রাণির আদর্শ রেশন তৈরি পদ্ধতি
- বাছুরকে খাদ্য খাওয়ানোর কর্মসূচী

দুগ্ধবতী গাভী একটি যন্ত্রের মতো যা কাঁচামাল (খাদ্য এবং পানি) কে দুধে রূপান্তর করে। কাঁচামাল হল উদ্ভিদজাত উপকরণ যা সাধারনত: মানুষের ভোজ্য নয়, তবে গাভী এগুলিকে উন্নতমানের মানব খাবারে রূপান্তর করতে সক্ষম। গাভীকে খাওয়ানোর লক্ষ্য হল দুধের উৎপাদন সর্বাধিক করা (গরুর প্রয়োজনীয় খাদ্য তা পূরণ করে) এবং গরুর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা। গবাদিপশুর খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটি দুধ উৎপাদনের মোট ব্যয়ের প্রায় ৭০%। দুগ্ধবতী গাভীর জন্য বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে শস্য ও শস্য উপজাত দানাদার খাদ্য, সবুজ ঘাস, খড় এবং স্টোভারের মতো ফসলের অবশিষ্টাংশ।

ডেইরি প্রাণির খাদ্য সরবরাহ ঃ

- একটি সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণিকে প্রতিদিন ৬ কেজি শুকনো এবং ১৫-২০ কেজি সবুজ ঘাস খাওয়ানো উচিত।
- লিগুউম এবং নন লিগুউম ১ ঃ ৩ অনুপাতে খাওয়াতে হবে।
- পশুখাদ্যের জন্য ৫০% ফ্লাওয়ারিং পর্যায়ে সবুজ ফসল কাটা উচিত।
- উদ্বৃত্ত সবুজ ঘাসকে 'হে' বা 'সাইলেজ' আকারে সংরক্ষণ করা যায়।
- আপতকালীন সময়ে বা গ্রীষ্মকালে যখন সবুজ খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা থাকে তখন সংরক্ষণ করা খাদ্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।
- প্রাণির শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুধ উৎপাদনের উচ্চ দক্ষতার জন্য 'বাইপাস প্রোটিন ফিড ' ব্যবহার করা উচিত।
- শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য খনিজ অপরিহার্য, প্রাণির রেশনে নির্দিষ্ট খনিজ মিশ্রণ সহ পরিপূরক হওয়া উচিত।
- এক খাদ্য থেকে অন্য খাদ্যে পরিবর্তন হঠাৎ করে নয়, ধীরে ধীরে হওয়া উচিত।
- মোট মিশ্রিত রেশন (টিএমআর) তৈরি করতে বিভিন্ন ফিড উপাদান এডিটিভসসহ মিশ্রিত করা উচিত। একদিনে এই রেশনটি সমানভাবে বিভক্ত করে ৩-৪ বারে খাওয়ানো উপযুক্ত হবে। এটি অপচয় কমাতে এবং হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

ভারসাম্য বা সুষম রেশন ঃ

দুগ্ধবতী গাভীর সুষম খাদ্য তৈরীর সময় প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। প্রাণির পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান মিশ্রিত করা উচিত, যা দেহের ওজন, দুধের উৎপাদন, প্রজনন (গর্ভাবস্থা) এর সাথে সর্ম্পকযুক্ত। একটি রেশন সুষম হবে যখন ২৪ ঘন্টা সময়কালে গরুর খাদ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপস্থিতি থাকে।

গবাদিপশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত ঃ

গবাদিপশুর খাদ্য যেভাবেই সরবরাহ করা হোক না কেন, সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করা উচিত-

- খাদ্যে পশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সূমহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে।
- যে সকল উপকরণ স্থানীয় বাজারে সহজে পাওয়া যায় সস্তা খাদ্য তৈরির জন্য সে সব উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ।
- খাদ্য অবশ্যই সু-স্বাদু ও সহজ পাচ্য হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে খাদ্য তৈরি করা উচিৎ।
- খাদ্য টাটকা হতে হবে। তাছাড়া ময়লা, ছাতাপড়া, দুর্গন্ধ ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে।
- দুগ্ধবর্তী গাভীর খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। খনিজ পদার্থের অভাবে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দুগ্ধদান কাল শেষে গাভী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর উদর পুর্তি হয়। খাদ্যের আয়তন বেশি হওয়া লাগবে।
- গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাস অত্যাবশ্যক। কাঁচা ঘাসে পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ আছে, তাছাড়া সহজে হজম হয়।
- খাদ্য উপাদান হঠাৎ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, প্রয়োজনে ধীরে ধীরে দিনে দিনে পরিবর্তন করতে হবে।

- খাদ্য অবশ্যই সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। যেমন- ছোলা, খেসারি, মাসকলাই, ভুট্টা, গম, খৈল ইত্যাদি মিশ্রণের পূর্বে ভেঙ্গে নিতে হবে। এর ফলে উপকরণগুলি সুষম ভাবে মিশানো যাবে এবং সহজে হজম হবে।
- ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন- খড়, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে পশুকে খাওয়াতে হবে। এতে যেমন অপচয় কম হবে তেমনি পশুর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমে সহায়ক হবে।
- খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে হবে।

কাঁচা ঘাস	খড়	হে	সাইলেজ	ফডার পাতা(ইপিল-ইপিল)
তিলের খৈল	ভূট্টা ভাঙ্গা		নাড়িকেলের খৈল	রাইস পলিশ
গম ভাঙ্গা	লবণ	সয়ামিল	ঝোলাগুড়	ডিসিপি পাউডার
গমের ভূষি	চালের কুড়া	ডাল ভাংগা	ভিটামিন প্রিমিক্স	পানি

গবাদিপশুর আদর্শ রেশন তৈরি পদ্ধতি ঃ

খাদ্যে শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) ভিত্তিতে গবাদিপশুর আদর্শ রেশন তৈরী করা হয়। গরুর দৈহিক ওজনের ওপর নির্ভর করে ঐ গরুর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শুষ্ক পদার্থের পরিমান নির্ণয় করা হয়। সাধারণত ১০০ কেজি ওজনের একটি গরুর জন্য ২.০ থেকে ২.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এ শুষ্ক পদার্থ আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে সরবরাহ করতে হবে। আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরুপ হওয়া প্রয়োজন।

মোট শুষ্ক পদার্থ ঃ

১. আঁশযুক্ত খাদ্য- ২/৩ ভাগ ঃ

ক) ২/৩ শুকনো আঁশযুক্ত খাদ্য খ) ১/৩ তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য

২. দানাদার খাদ্য- ১/৩ ভাগ

৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য প্রয়োজনীয় মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে দেখানো হলো।

- ❒ গরুর দৈহিক ওজন = ৪০০ কেজি
- ❒ মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ = ৪২.৫ = ১০ কেজি @ ২.৫/১০০ কেজি দৈহিক ওজন।
- ➢ আঁশযুক্ত খাদ্য হতে শুষ্ক পদার্থ = ১০২/৩ = ৬.৬৬ কেজি।
- ➢ দানাদার খাদ্য হতে শুষ্ক পদার্থ = ১০১/৩ = ৩.৩ কেজি

যখন আঁশযুক্ত খাদ্য লিগুম জাতীয় হবে তখন শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরুপ হবে ঃ

- শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬৬৩/৪ = ৪.৯৫ অর্থাৎ ৪.৯ কেজি।
- তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬৬১/৪ = ১.৬৫ অর্থাৎ ১.৬ কেজি।

যখন সাধারণ আঁশ জাতীয় খাদ্য হবে তখন নিম্নরুপ হবে ঃ

- শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬২/৩ = ৪.৪ কেজি।
- তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬১/৩ = ২.২ কেজি।

৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য শুষ্ক পদার্থ ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ঃ

ক্রমিক	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)	শুষ্ক পদার্থ (%)	মোট দেয় শুষ্ক পদার্থ (কেজি)
১	খড়	৪.৫	৯০	৪.০৫
২	সবুজ কাঁচা ঘাস	১৭.৫	১৫	২.৬২
	ক) মোট আঁশ জাতীয় খাদ্য =	২২ কেজি	-	৬.৬৭ কেজি
৩	চালের ভূষি/গমের ভূষি	৩.০	৯০	২.৭
৪	সরিষা/তিলের/সয়াবিন খইল	০.৯	৮৫	০.৮
৫	লবণ	০.০৫	-	-
৬	খনিজ+ভিটামিন	০.০৫	-	-
	খ) মোট দানাদার খাদ্য =	৪.০ কেজি	-	৩.৫ কেজি
	দৈনিক মোট রেশন	২৬ কেজি	-	১০.১৭ কেজি

দুগ্ধবতী গাভীকে পর্যায় ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ (Phase Feeding) ঃ

দুগ্ধদানকারী গাভীর জন্য রেশন গঠনের সময় রেশনের মান গাভীর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত যা দুধের উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। যেমন- প্রাথমিক পর্যায়ে দুগ্ধবতী গাভীর পুষ্টি পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় বেশি প্রয়োজন।

যেহেতু প্রতিটি গাভীর জন্য পৃথক রেশন প্রণয়ন কার্যত সম্ভব নয়, তাই খামারের গরুগুলিকে প্রয়োজনীয় সাধারণ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রুপভিত্তিক (strings) পদ্ধতিতে খাওয়ানো উচিত। দুগ্ধদানের একই পর্যায়ে গাভীর পুষ্টি প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনুরূপ থাকবে এবং তাই দুগ্ধদানের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে রেশনগুলি তৈরি করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় ঃ (১-৭০ দিন)

- এই ধাপের সময়, খাদ্য খাওয়ার তুলনায় দুধের উৎপাদন আরও দ্রুত বৃদ্ধি পায় ফলে খাদ্যে উচ্চতর শক্তির চাহিদা হয়।
- এই পর্যায়ে গরুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি গুরুত্বপূর্ন এবং দুগ্ধদানের পুরো কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
- এই পর্যায়ে গাভী সর্বোচ্চ উৎপাদন অর্জন করে থাকে। দুধের উৎপাদন ঠিক রাখতে খাদ্যে শক্তি এবং প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বেসল ডায়েটে দানাদার যুক্ত করা উচিত কারণ একমাত্র ঘাস যথেষ্ট হবে না।
- এই প্রথম পর্যায়ে নিম্নমানের খাদ্য খাওয়ানো গাভীগুলি কাংখিত উৎপাদন অর্জন করে না এবং প্রথম সপ্তাহ থেকে দুধের উৎপাদন হ্রাস পায়। খাদ্যে দানাদার শুষ্ক পদার্থের পরিমান ৫০-৬০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।
- এই পর্যায়ে, উচ্চ প্রোটিন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেহ সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে না এবং ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রুমেনে সংশ্লেষিত) কেবল আংশিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। উচ্চ উৎপাদনশীল গাভীগুলির জন্য ১৮% ক্রুড প্রোটিনযুক্ত রেশন সরবরাহ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পর্যায় : (৭০-১৫০ দিন)

এই পর্যায়ে দুধ উৎপাদন ও শারীরিক ওজন ঠিক রাখতে শুষ্ক পদার্থ গ্রহণের পরিমান পর্যাপ্ত হওয়া জরুরী। দুধের সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর প্রতি মাসে ৮-১০% হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। এসময় রেশনে উচ্চ মানের ঘাস এবং ১৬-১৮% সিপি থাকতে হবে। পরিপাকযোগ্য উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ দানাদার উপাদান (স্টার্চের পরিবর্তে) গম বা ভুট্টা ভূষি শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তৃতীয় পর্যায় : (১৫১-৩০৫দিন)

এই পর্যায়ে গাভীর খাদ্য গ্রহণ এবং দুধ উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। এসময় দুধ উৎপাদন, শরীরের মজুদ পুনরুদ্ধার এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্য পূরণ করে থাকে। শরীরের ওজন বৃদ্ধি শরীরের মজুদ পুনরায় পূরণের কারণে এবং দুগ্ধ দানের শেষের দিকে, ভ্রূণের বৃদ্ধির কারণে হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে অন্যান্য দুটি পর্যায়ের তুলনায় গাভীগুলিকে নিম্ন মানের রাফেজ এবং সীমিত পরিমাণে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো যেতে পারে। এ সময় খাদ্যে ক্রুড প্রোটিনের পরিমান ১৫-১৬% রাখা যেতে পারে।

চতুর্থ পর্যায় : (শুষ্ককাল ৩০৫-৩৬৫ দিন)

এই পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ভ্রূণের ওজনের কারণে গাভীর ওজন বাড়িয়ে তোলে। গাভীর যথাযথ খাদ্য সরবরাহ পরবর্তী দুগ্ধদানের সময় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রসবপরবর্তী (মিল্ক ফিভার এবং কিটোসিস) স্বাস্থ্যের সমস্যা হ্রাস করতে সহায়তা করে। শুষ্ককালীন সময় গাভীকে রক্ষণাবেক্ষণ ও গর্ভাবস্থার জন্য ব্যালান্সড রেশন খাওয়ানো উচিত। তবে প্রসবের দুসপ্তাহ আগে গাভীকে পরবর্তী দুগ্ধদানের জন্য প্রস্তুত করার জন্য দানাদার খাওয়ানো উচিত। এ সময় রেশনে ক্রুড প্রোটিনের পরিমান ১২-১৫% এর মধ্যে রাখতে উচ্চ মানের রাফেজ এবং সাধারন দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর জন্য গাইড লাইনস ঃ

দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ানোর জন্য পিলেট আকারে বাজারে বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক দানাদার খাবার পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে সুষম দানাদার খাদ্য বাড়িতেও তৈরি করা যায়। উন্নতমানের ঘাস সরবরাহ করা গেলে দানাদার পরিপূরক ছাড়াই প্রতিটি গাভী থেকে প্রতিদিন ৭-২০ কেজি দুধ উৎপাদন করা সম্ভব।

গাভীর দানাদার সরবরাহের গাইড লাইন ঃ

জাত	উৎপাদন সূচক (কেজি / দিন)	দুধ উৎপাদন এবং দানাদার সরবরাহ অনুপাত (কেজি দুধ/কেজি দানাদার)
ফ্রিজিয়ান	<১৮	৪ ঃ ১
	১৮-৩০	৩ ঃ ১
	> ৩০	২.৫ ঃ ১
জার্সি	<১৩	৩ ঃ ১
	১৩-২৮	২.৫ ঃ ১
	> ২৮	২ ঃ ১
শাহিওয়াল	৫-৭	২.৫ ঃ ১
	> ৭	২ ঃ ১

বাছুরকে খাদ্য খাওয়ানোর প্রোগ্রাম ঃ

খামারের বাছুরকে খাওয়ানোর প্রোগ্রামের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

১. বাছুরের জন্মের সময় শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং তাই তাকে অবশ্যই কোলস্ট্রাম দেওয়া উচিত। কোলস্ট্রামে অ্যান্টিবডি রয়েছে যা বাছুরকে রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। জন্মের পরে ১২ ঘন্টা এর মধ্যে তাদের কোলস্ট্রাম শোষণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ এবং ২৪ ঘন্টা পরে খুব কম থাকে।

২. নবজাতক বাছুরটি প্রথম জীবনে পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য দুধের উপর নির্ভরশীল কারণ এসময় তার রুমেন কার্যকরী নয়। স্তন্যপায়ী রিফ্লেক্স একটি ভাঁজ (খাঁজ) গঠন করে যা অল্প বয়সী বাছুরের (খাদ্যতন্ত্রের পেটকে পেছনে ফেলে) খাদ্যনালী থেকে অ্যাবোমাসামে

সোজা দুধ সরবরাহ করার জন্য একটি পাইপ হিসাবে কাজ করে। অতএব, তরুণ বাছুরগুলিকে কেবল তরল খাবার খাওয়ানো উচিত কারণ খাঁজগুলি শক্ত খাবারগুলি অতিক্রম করতে দেয় না।

৩. বাছুরগুলি উচ্চ পরিমাণে ল্যাকটেজ এনজাইম সঞ্চার করে (দুধে ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজকে শক্তি সরবরাহের জন্য ভেঙে দেয়) পক্ষান্তরে অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইমগুলি কম থাকে। মিল্ক রিপ্লেসার গঠনের সময়, শক্তির উৎসটি দুধের ল্যাকটোজ হওয়া উচিত। বাছুরগুলির কোন সুক্রেজ এনজাইম নেই এবং তাই সুক্রোজ (সাধারণ চিনি) খাওয়ানো উচিত নয়।

৪. যেহেতু রুমেন কার্যকরী নয়, বাছুরটি বি ভিটামিন সংশ্লেষ করতে পারে না এবং তাদের অবশ্যই খাদ্যতালিকায় সরবরাহ করা উচিত। নবজাতকের বাছুরের ডায়েটে দুধের প্রোটিন থাকা উচিত কারণ জটিল প্রোটিনগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য এনজাইমগুলি জন্মের ৭-১০ দিন অবধি বিকশিত হয় না।

৫. বাছুরকে শক্ত খাবারে অভ্যস্থ করানো ঃ

বাছুরকে শক্ত খাবারের সাথে পরিচিত করার সাথে সাথে রুমেনগুলি বিকাশ শুরু করে এবং বাছুরটি যত তাড়াতাড়ি পর্যাপ্ত শুকনো খাবার (দেহের ওজনের ১.৫%) গ্রহণ করতে পারে তত তাড়াতাড়ি দুধ ছাড়ানো যায়। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে শুকনো খাবারটি প্রথম দিকে শুরু করা উচিত, কারণ রুমেনের বিকাশের জন্য শক্ত খাবার প্রয়োজন। শস্য ভিত্তিক খাবারগুলি রাফেজগুলির তুলনায় রুমেন পেপিলি (যা রুমেন কাজকে উৎসাহ দেয়) এর দ্রুত বিকাশে সহায়ক।

খামারের বকনা বাছুর ভবিষ্যতের দুগ্ধগাভীর ভিত্তি। খামারে প্রতিস্থাপনের নির্বাচন কেবল তখনই কার্যকর হতে পারে যদি ভাল মানের প্রতিস্থাপনের জন্য বকনা তৈরী যায়।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা এবং রুমেন বিকাশের জন্য বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা দেওয়া উচিত। একটি বাছুরকে খাওয়ানোর প্রোগ্রাম ডিজাইন করার সময়, লক্ষ্য রাখা উচিত প্রায় ৪০০-৫০০ গ্রাম/দিন দৈহিক বর্ধনের হার বজায় রেখে মৃত্যু হার হ্রাস করা। বাছুরের বৃদ্ধির হার বিভিন্ন জাতের সাথে পরিবর্তিত হয়, বড় জাতের জন্য দুধ ছাড়ানো বয়সে (Weaning) বাছুরের ওজন প্রায় ৮০ কেজির কাছাকাছি থাকে।

বাছুরকে খাওয়ানোর পর্যায় ঃ

পর্যায় নং	পর্যায়	খাবারের ধরণ	খাদ্য
১ম	কোলস্ট্রাম পর্ব (১ - ৪ দিন)	তরল	কলস্ট্রাম
২য়	প্রাক-রুমিনেন্ট পর্যায় (৫ দিন থেকে ২০ - ৩০ দিন)	তরল	দুধ
৩য়	ট্রানজিশন বা পরিবর্তনের পর্যায়ে (৩০ - ৯০ দিন)	তরল ও শুকনো	মিল্ক রিপ্লেসার ও কাফ ষ্টাটার
৪র্থ	দুধ ছাড়ানোর পর্যায়ে (৯০ - ১২০ দিন)	শুকনো	কাফ ষ্টাটার

বাছুরের বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) তৈরী ও খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ

উপাদানঃ ১) গুড়া দুধ-৭০% ২) চাল/গম/ভূট্টার গুড়া-২০%
৩) সয়াবিন তেল-৭% ৪) লবন-১% ৫) ডিসিপি- ১.৫%
৬) ভিটা-মিনারেল প্রিমিক্স-০.৫%

প্রস্তুত প্রনালী ঃ উক্ত মিশ্রনের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ বিশুদ্ধ পানি মেশাতে হবে। টিউবওয়েলের পানিকে অন্তত: ৫মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে (কুসুম গরম) বিকল্প দুধ তৈরীতে ব্যবহার করতে হবে। বিকল্প দুধ ফিডারে করে খাওয়াতে হবে। ফিডার, নিপল, দুধের পাত্র পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। বিকল্প দুধ তৈরী করে ১-২ ঘন্টার বেশী রাখা উচিত নয়।

কাফ ষ্টাটার তৈরী ও খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ

কাফ ষ্টার্টার তৈরীর ফর্মূলা

ক্র.নং	উপকরণ	পরিমান(%)
১.	ভূট্টা ভাংগা	৫২
২.	গম/ওটস্ ভাংগা	২০
৩.	সয়াবিন মিল	২০
৪.	মোলাসেস	৫
৫.	ঝিনুক পাউডার	১
৬.	ডিসিপি	০.২৫
৭.	লবন	০.২০
৮.	তেল/চর্বি	১.৫
৯.	ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট	০.০৫
	মোট	১০০

বাছুরের খাদ্য সরবরাহ ঃ

বাছুরের বয়স(দিন)	দুধ (কেজি/দিন)	মোট দুধ(কেজি)	কাফ ষ্টাটার	রাফেজ
১-৭	কলষ্ট্রাম	-	-	-
৮-২১	৫	৭০	সামান্য/এক মুঠো	-
২২-৪২	৬	১২৬	০.৫	পছন্দমত
৪৩-৫৬	৫	৭০	০.৫	পছন্দমত
৫৭-৬৩	৪	২৮	১	পছন্দমত
৬৪-৭৭	৩	৪২	১	পছন্দমত
৭৮-৮৪	২	১৪	১.৫	পছন্দমত
দুধ ছাড়ানো বয়স	-	-	-	-
মোট		৩৫০	৫৫	-

সেশন-১১

ডেইরি প্রাণির জন্য সম্পূর্ন মিশ্রিত রসদ এবং খাদ্যে রুমেন বাইপাস প্রোটিনের গুরুত্ব

Importants of Total Mixed Ration & Rumen Bypass Protein in Dairy Herd

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- টিএমআর-এর সুবিধাদি ও অসুবিধা
- টিএমআর তৈরীর উপকরণ ও পরিমাণ
- টিএমআর সরবরাহ পদ্ধতি
- বাইপাস প্রোটিন ফিডের গুরুত্ব
- বাইপাস প্রোটিন ফিডের উপকারিতা
- গবাদিপশুতে বাইপাস প্রোটিনের পরিপাক ও শোষণ
- বিভিন্ন গো-খাদ্যে বাইপাস প্রোটিনের পরিমান

সম্পূর্ন মিশ্রিত রসদ বা টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) হল গবাদিপশুর জন্য কম্পিউটার বেইজড একটি সুষম সর্ম্পূন খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি। টিএমআর খাদ্য খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি গাভী তার প্রয়োজনীয় স্তরের পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। টিএমআর-এ ভাল মানের ছোবড়া, দানাদার এবং প্রোটিনের ভারসাম্য, ভিটামিন এবং খনিজ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। টিএমআর গরুর স্বাস্থ্য, দুধ উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। টিএমআর গঠনের মূল চাবিকাঠি শুষ্ক পদার্থের সর্বাধিক গ্রহণ, যা উৎপাদন এবং জাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

টিএমআর-এর সুবিধাদি ঃ

- ❑ খাদ্য খাওয়ানো কর্মসূচির উপর খামারির নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে।
- ❑ দুধের উৎপাদন, স্বাস্থ্য, প্রজনন ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়।
- ❑ গরু খাওয়ানোর কাজের ভার হ্রাস করা যায়, এতে শ্রমের ব্যয় সাশ্রয় হয়।
- ❑ নির্দিষ্ট গরুকে ফিড দেওয়ার জন্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণের আরও ক্ষমতা দেয়।
- ❑ সমস্ত ছোবড়া, শস্য, প্রোটিন পরিপূরক, খনিজ এবং ভিটামিনগুলি ভালভাবে মিশ্রিত হয়। অতএব, গাভী পৃথক রেশন উপাদানগুলির জন্য খুব সামান্য বাছাই করতে পারে।
- ❑ খামারের গরুগুলিকে গ্রুপিংয়ের সাথে মিলিয়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে পুষ্টি (শক্তি, প্রোটিন ইত্যাদি) খাওয়ানোর ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ আনে।
- ❑ পালের কম উৎপাদনকারী গরুকে বেশি খাওয়ানো ছাড়াই দানাদার মিশ্রণগুলি গোষ্ঠীভুক্ত উচ্চ উৎপাদনকারী গরুকে উদারভাবে খাওয়ানো যেতে পারে।

টিএমআর-এর অসুবিধা ঃ

- ❑ গরুগুলিকে বিভিন্ন উৎপাদন স্তরে ভাগ করতে হয়।
- ❑ ছোট খামারে (৫০ টিরও কম গরুর) গাভী গোষ্ঠীকরণ সম্ভব হয় না।
- ❑ গরু দুটি গ্রুপে বিভিন্ন সংখ্যক গরু পরিচালনা করতে না পারলে গরুকে গ্রুপ করা সহজ নয়
- ❑ উৎপাদন অনুসারে গোষ্ঠীভুক্ত করা না হলে, ল্যাকটেশনের শেষ পর্যায়ের গাভীগুলি খুব বেশি চর্বিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ❑ সঠিক পুষ্টিসম্পন্ন টিএমআর তৈরীতে কম্পিউটার বিশেষ সফট্ওয়ার ব্যবহার করতে হয়।
- ❑ বিশেষ সরঞ্জাম ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

টিএমআর ফিডিং ম্যানেজমেন্ট ঃ

টিএমআর তৈরীর পূর্বে ছোবড়াগুলি সঠিকভাবে কাটা উচিত। সাইলেজ এবং খড়ের বেশির ভাগ টুকরার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩/৮ থেকে ৩/৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হওয়া উচিত। দানাদার খাদ্যের সূক্ষ্ম কণা বা খুব মোটা অংশ রেশনে এড়ানো উচিত।

খড়ের বা হে এর শুষ্ক পদার্থ ভাল-থেকে-সেরা মানের ছোবড়া ধারণ করে, বিশেষত উচ্চ উৎপাদনকারী প্রাণিদের জন্য। ঘাসে আগাছা উপস্থিতি এবং পানির গুণাগুণ টিএমআর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। যখন ঘাস খুব সূক্ষ্মভাবে কাটা হয় বা অতিরিক্ত

দানাদার শুষ্ক পদার্থ উপস্থিত থাকে তখন শুকনো পদার্থ গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে গরু প্রত্যাশিত শুকনো পদার্থ গ্রহণের হার ৫% এর মধ্যে হওয়া উচিত। যদি প্রকৃত শুকনো পদার্থ গ্রহণের হার ৫% ছাড়িয়ে যায় তবে সেই রেশন সংস্কার করা উচিত। প্রথম দুই সপ্তাহের পরে গাভীর শুকনো পদার্থ গ্রহণ শরীরের ওজনের গড়ে ২% হতে পারে।

গাভীর জন্য আদর্শ টিএমআর তৈরীর উপকরণ ও পরিমান ঃ

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমান	পুষ্টি (প্রতি কেজি)
১.	আঁশ জাতীয় খাদ্য (ফরেজ)-	৫০%	আমিষ-১৫-১৬% শক্তি-২.২-২.৫ মেগা ক্যালরী
২.	ভূট্টা (কর্ন) ভাংগা	১০%	
৩.	রেপ সীড (ক্যানোলা) মিল	১০%	
৪.	কটনসীড মিল	৫%	
৫.	সয়াবিন মিল (৪৯% ক্রুড প্রোটিন সমৃদ্ধ)	১১%	
৬.	মিট এন্ড বোন মিল (৫০% প্রোটিনসমৃদ্ধ)	১.৫%	
৭.	এনিম্যাল ফ্যাট/চর্বি	২.৫%	
৮.	চিনির উৎস (মোলাসেস)-	৫%	
৯.	ভিটামিন-মিনারেল উৎস-	৫%	
	মোট	১০০%	

ডেইরি প্রাণির খাদ্যে রুমেন বাইপাস প্রোটিনের ব্যবহার ঃ

রুমেন বাইপাস প্রোটিন হল একটি প্রাণি বা উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন উৎস যা গরুর রুমেনের অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করে সরাসরি যাতে নীচের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে প্রবেশ করে জারক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষিত হয়ে গরুর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড রক্তে সরবরাহ করে।

বাইপাস প্রোটিন হল সেই ডায়েটরি প্রোটিন যা রুমেন থেকে নিম্ন পাচনতন্ত্রে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অটুট থাকে। ডাইজেস্টেবল বাইপাস প্রোটিন হল বাইপাস প্রোটিনের সেই অংশ যা এনজাইম্যাটিকভাবে হাইড্রোলাইজড হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড হিসাবে দেহে শোষিত হয়।

বাইপাস প্রোটিন ফিডের গুরুত্ব ঃ Growth প্রোটিনগুলি প্রাণির দৈহিক বৃদ্ধি এবং দুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। সাধারণত, ফিড প্রোটিনগুলির প্রধান অংশ পাকস্থলির প্রথম অংশ রুমেনে ভেঙে যায়।

বাইপাস প্রোটিন ফিডের ক্ষেত্রে, প্রোটিনের উল্লেখযোগ্য অংশটি পাকস্থলির প্রথম অংশ রুমেনে ভেঙে যায় এবং গ্যাস্ট্রো-ইনস্টিনাল ট্র্যাক্টের পরবর্তী অংশে প্রবেশ করে যার ফলে দেহে প্রোটিনের আরও ভাল ব্যবহার হয় ।

বাইপাস প্রোটিন ফিড রাসায়নিকভাবে প্রক্রিয়া করেও প্রোটিন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাইপাস প্রোটিন ফিডের উপকারিতা ঃ

- ❑ বাইপাস প্রোটিন কম দামে অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য।
- ❑ ডায়েটারি প্রোটিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এটি প্রাণির দৈহিক বৃদ্ধি এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। যদি স্বাভাবিক 'বাইপাস প্রোটিন ফিড' পাওয়া না যায়, তবে ১ কেজি 'ট্রিটমেন্ট করা বাইপাস প্রোটিন পরিপূরক' ৮-১০ লিটার দুধ উৎপাদনকারী প্রাণিকে (সকালে আধা কেজি এবং সন্ধ্যায় আধা কেজি) খাওয়ানো যেতে পারে। কখন বাইপাস প্রোটিন গবাদিপশুকে খাওয়ানে হয় ঃ বাইপাস প্রোটিন এর উপকারিতা বেশী পাওয়া যায় যখন প্রাণির প্রোটিনের চাহিদা মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনের মাধ্যমে পূরনা হয় না।

বাইপাস প্রোটিনের ব্যবহার ঃ

ক) অধিক দুধ উৎপানশীল গাভীর ল্যাকটেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে (দুধ উৎপাদণ > ১৫ কেজি/দিন)।
খ) দ্রুত বর্দ্ধনশীল বাছুর (বৃদ্ধি ১ কেজি/দিন)।
গ) প্রাণি যখন শুধু নিম্নমানের অ্যাঁশ জাতীয় খাদ্যের উপর জীবন ধারন করে।
ঘ) প্রাণির ধকলকালীন সময়।

রুমেন বাইপাস প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের ব্যবহার ঐতিহ্যগতভাবে কেবল দুধ উৎপাদনকারী গাভীর কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আগ্রহী। তবে বাড়ন্ত গবাদিপশুদের উচ্চমানের প্রোটিনের সরবরাহ তার দৈহিক বৃদ্ধি, বৃদ্ধি দক্ষতা এবং লাভের ক্ষেত্রে বিশেষত হৃস্টপুষ্টকরন ষাঁড়ের জন্য যথেষ্ট ফলদায়ক হয়।

গো-খাদ্যে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বাইপাস প্রোটিনের উৎস ঃ

ক) লো বাইপাস প্রোটিন

সয়াবিন সীড মিল

সানফ্লাওয়ার সীড মিল

রেপ (ক্যানোলা) সীড মিল

খ) হাই বাইপাস প্রোটিন

ফিস মিল

ব্লাড মিল

মিট মিল

BYPASS PROTEIN PRESENT IN DIFFERENT FEEDSTUFFS

Feed	RUP (%)	Feed	RUP (%)
Blood meal	80	Soybean hulls	42
Fish meal	70	Berseem	37
Bajra	68	Wheat grain	36
Soybeans, roasted	65	Linseed meal	35
Maize (grain)	65	Cotton seed meal	35
Wet brewers grain	64	Soybean meal	35
Rice straw	63	Cowpea	32
Meat & bone meal	55	Alfa-Alfa hay	30
Corn gluten meal	55	Groundnut meal	30
Brewer's dried	53	Corn silage	30
Para grass	52	Rapeseed meal	28
Sorghum	52	Barley	27
Subabul	51	DORB	25
Cottonseed hulls	50	Sunflower meal	24
Rice bran	49	Oat grain	20
Wheat straw	45	Urea	0_{24}

* RUP= Rumen Undegradable Protein

Specification for Bypass Protein Feed

CHARACTERISTICS	%, DM basis
Moisture ,% by mass , Max.	10
CP(N×6.25),% by mass , Min.	30
EE, % by mass, Min.	3.5
CF,% by mass, Max.	8.0
AIA,% by mass, Max.	2.5
UDP,% by mass, Min.	20
RDP,% by mass, Max.	9

Source: NDDB,Anand

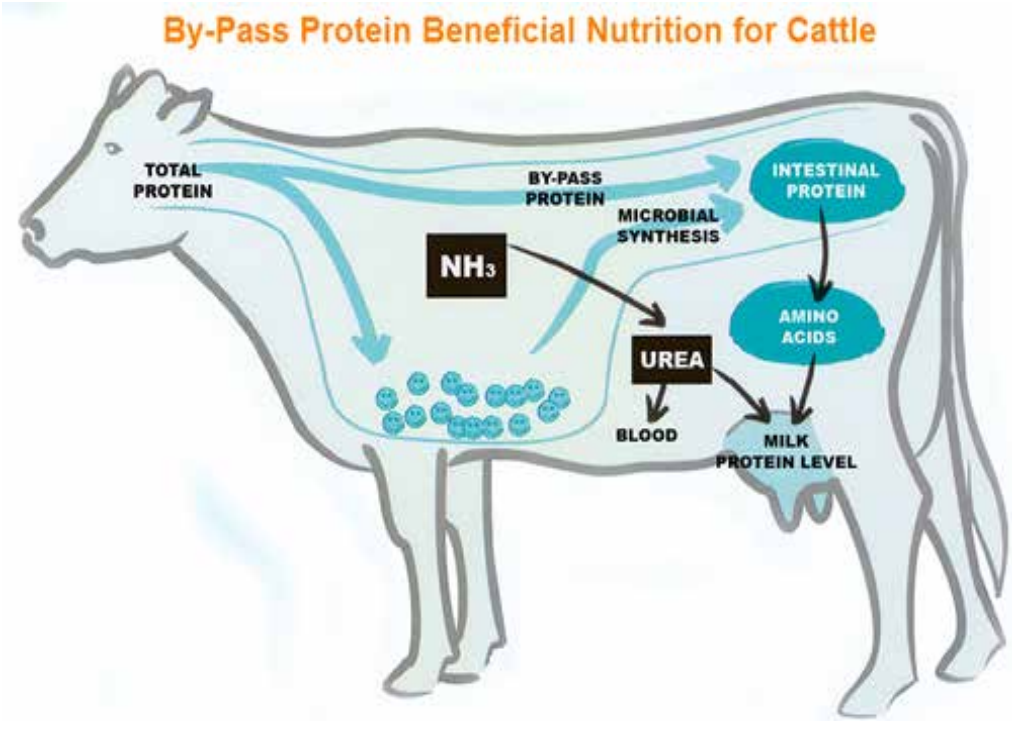

সেশন-১২

ডেইরি প্রাণির সবুজ ঘাস (ফডার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ

(Fodder Production and Conservation for Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- সবুজ ঘাস এর গুরুত্ব
- সবুজ ঘাসের পরিচিতি
- সবুজ গো-খাদ্য সংরক্ষণে হে তৈরী
- সবুজ গো-খাদ্য সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী

সবুজ ঘাস দুগ্ধজাত প্রাণির পুষ্টির একটি আর্থিক সাশ্রয়ী খাদ্য উৎস। রোমন্থনকারী প্রাণির জন্য সবুজ ঘাস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সহজে পরিপাকযোগ্য। মিশ্র খাদ্য খাওয়ানো পদ্ধতিতে সবুজ ঘাসে উপস্থিত অণুজীবগুলি ফসলের অবশিষ্টাংশের পরিপাক ক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করে। এটি গবাদিপশুর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। গবাদিপশুর রেশনে সবুজ ঘাসের ব্যবহার বাড়ালে দুধের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে পারে।

সবুজ ঘাসের চাহিদা ও প্রাপ্যতার মধ্যে ব্যবধান কমাতে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের ঘাসের চাষ করা প্রয়োজন। খামারে সারা বছর সবুজ ঘাসের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য নিম্ন বর্নিত ঘাস চাষ ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. সর্বদা উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস রোপণ ও উপাদান ব্যবহার করতে হবে।
২. বছরব্যাপী ঘাস চাষের জন্য (জমি প্রস্তুতি, সময়মতো বীজ বপন, সার প্রয়োগ, সেচ, আগাছা দমন এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ও ঘাস সংগ্রহ) উন্নত ঘাস চাষ অনুশীলন প্যাকেজ অনুসরণ করা উচিত।
৩. দুটি প্রধান মৌসুমী ফসলের মধ্যে স্বল্পকালীন জাতের গো-খাদ্য যেমন সূর্যমুখী, চীনা বাঁধাকপি, শালগম ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে।
৪. ভুট্টা, বজরা এবং সরগমের মতো সিরিয়াল ফসলের সাথে কাউপি, গুচ্ছ শিম এবং মখমল শিমের মতো সাথি ফডার চাষ করা যেতে পারে।
৫. উচুঁ জমিতে হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাসের মতো উচ্চ ফলনশীল বহু-কাটা বহুবর্ষজীবী ঘাসের চাষ এবং ছায়া সহনশীল গিনি ঘাসের পাশাপাশি স্টাইলো বা সিরোট্রো চাষ করা যেতে পারে।
৬. খরা সহিষ্ণু আঞ্জান ঘাস, সিওয়ান ঘাস, রোডস ঘাস এবং ফডার গাছ যেমন দেশী বাবুল, নিম, শিসাম, কাঞ্চন, খেজরি, সুবাদুল প্রভৃতি খামারের পতিত জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

সবুজ গো-খাদ্য সংরক্ষণ ঃ

দুগ্ধ খামারে সারা বছর প্রাণির পুষ্টির জন্য গুণগত মান সম্পন্ন রাফেজ বা কাঁচা ঘাস ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা অতি জরুরী। সাধারণত, জুলাই-সেপ্টেম্বর এ প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (বর্ষা মৌসুম) এবং ফেব্রুয়ারি - মার্চ (রবি মৌসুম) এ কাঁচা ঘাসের প্রাপ্যতা সীমিত থাকে। আপতকালীন সময়ে প্রাণির আঁশ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখতে খামারের উদ্বৃত্ত সবুজ ঘাস, লতাপাতা ও খড় 'হে' ও 'সাইলেজ' আকারে সংরক্ষণ করা যায়।

সবুজ ঘাস সংরক্ষণে হে তৈরী পদ্ধতি ঃ

"হে" হল সূর্য কিরণে শুকনো সবুজ ফডার ঘাস যার আর্দ্রতা ১৫ শতাংশের নিচে থাকে। খাদ্য ঘাটতি সময়কালে এটি দুগ্ধ প্রাণির জন্য হজমযোগ্য শুষ্ক পদার্থ এবং অশোধিত প্রোটিনের একটি ভাল উৎস। গ্রীষ্মের মার্চ থেকে মে মাসে গরম এবং শুকনো আবহাওয়ায় আলফা আলফা, লুসার্ন, ওটস এবং মিষ্টি সুদান ঘাসের মতো পাতলা স্টেম থেকে সেরা মানের হে তৈরি করা হয়। গিনি ঘাস, রোডস ঘাস, অঞ্জন, ধামন ঘাসের মতো কয়েকটি বহুবর্ষজীবী ঘাসও হে তৈরির জন্য উপযুক্ত। সেরা মানের হে পেতে, এই ফসলগুলি ৫০ শতাংশ ফুলের পর্যায়ে কাটা হয়। কাটার পরে, সবুজ পাতাগুলি সূর্যালোকে শুকানোর জন্য ৫ সেন্টিমিটার পুরু পাতলা স্তরে শুকনো স্থানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতি দিন সকালে ১০ টার পরে সমানভাবে শুকানোর জন্য ঘাসগুলি হাত দিয়ে বা যান্ত্রিকভাবে

উল্টায়ে দিতে হবে। ৪ থেকে ৫ দিনের পরে, যখন ঘাসে আর্দ্রতা ১৫ শতাংশের ও কমে পৌঁছে যায়, তখন ঘাসগুলি 'হে' তে রুপান্তরিত হয়। এ অবস্থায় 'হে' গুলি সংগ্রহ করা হয় এবং সংরক্ষণের জন্য বান্ডিল তৈরি করা হয়। শুকানোর সময়, যত্ন নেওয়া উচিত যেন হে এর পাতা এবং সবুজাভ রঙ ধরে রাখে, কারণ এটি ভাল মানের খড়ের সূচক।
'হে' এর এই বান্ডিলগুলি বাঙ্কার বা গোডাউনে আর্দ্রতা ও ধুলাবালি মুক্ত জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে এতে দীর্ঘ সময়ের জন্য 'হে' এর মান বজায় থাকে।

রৌদ্রে শুকানো সবুজ ঘাস (হে)

সংরক্ষিত হে বান্ডিল

সংরক্ষিত হে বান্ডিল

সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি ঃ

সাইলেজ তৈরী ঃ সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। অথবা সাইলেজ হলো গাজনকৃত সবুজ ঘাস। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশে সংরক্ষণ করাহয়। এই প্রক্রিয়াজাত ফডারকে সাইলেজ বলে। বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদিপশুকে তা সরবারহ করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরির মূলনীতি হলো, যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেড হয়, তখন ল্যাকটিক এসিড তৈরী হয়ে থাকে এবং এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষনে সহায়তা করে থাকে।

সাইলেজ তৈরীতে উপযোগী ফডার বা ঘাস ঃ

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধারণত নন-লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যেমন,ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। তবে লিগিউম জাতীয় ফডার দিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির এর সাথে ভূট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা হয়। এভাবে সাইলেজ তৈরী করলে লিগুমিনাস ফডারে যে কার্বোহাইড্রেট কম থাকে তার অভাব পূরণ করে কার্বহাইড্রেট পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমান কমে আসে। ফলে সাইলেজ ভাল ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং খড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া, খামারের আকার, খামারির অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ তৈরীতে বিভিন্ন প্রকার সাইলো পিট ব্যবহার করা হয়।

১। গ্যাসটাইট সাইলো ঃ ক) কংক্রিট স্টেভ খ) ইটের স্টেভ

২। পিট বা গর্ত সাইলো

৩। টাওয়ার সাইলো ঃ ক) কংক্রিট স্টেভ খ) কাঠের স্টেভ গ) ইটের স্টেভ

৪। সমান্তরাল সাইলো ঃ ক) ট্রেঞ্চ সাইলো (মাটির গর্ত) খ) বাঙ্কার সাইলো (মাটির উপর)

৫। স্বল্পস্থায়ী সাইলো ঃ প্লস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ সাইলো

আমাদের দেশের সাধারন খামারী ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সহজে ও কম খরচে একজন খামারী বা কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরি করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো-

ক) মাটির গর্ত পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারীরা অতি সহজেই সাইলেজ তৈরী করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়া ও অপ্রচলিত ফডার যেমন মেইজ স্ট্রভার, সুগার কেইন টপ এমনকি প্রাকৃতিক সবুজ ঘাসও সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায়।

মাটির গর্ত বা পিট তৈরী ঃ

একশত ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ২.৫ - ৩.০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে, যাতে গর্তের

মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থ নীচে ৩-৪ ফুট মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারণত: সবুজ ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলায় চার কোনা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি ঃ

যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হবে। সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার যত বেশী চেপে মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশি উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলাসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে । তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ ঃ ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের জন্য ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাঁচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভাল ভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত মানসম্মত হবে। সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে সাইলো গর্ত একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারনে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ও কয়েকদিন ব্যাপি সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়।

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ ঃ মাটির গর্ত ছাড়াও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরি খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিদে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদিপশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাবে মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউড গবেষণা করে দেখেছেন যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত ঃ

১. সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুষ্ক পদার্থ থাকা প্রয়োজন।
২. নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না।
৩. উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি সাইলেজ এর ভিতরে প্রবেশ না করে।
৪. চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
৫. ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে।
৬. গরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর বা অন্য প্রাণি যাতে উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

সাইলেজ তৈরীতে প্রয়োজনে এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজন করতে হবে–

সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ ঃ (১) নালীগুড় ঃ ৩-৪% হারে (২) ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে (৩) লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে (৪) জৈব এসিড ঃ ১% হারে (৫) ব্যাটেরিয়াল কালচার ঃ প্রয়োজন মত

সাইলেজের উপকারিতা ঃ

- ঘাসের সাইলেজে ৮৫% পুষ্টি পাওয়া যায়।
- এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।
- বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।
- সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য।
- এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ।
- গন্ধ-আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ।
- পিএইচ মাত্রা ৩.৫-৪.৫।

গবাদিপশুকে সাইলেজ খাওয়ানো ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যেখানে সাইলেজকে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমান সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

গবাদিপশুর ফডার জাতীয় ঘাস

Fodder Maige-African Tall

Lucerne

Oats

Multi cut Sorghum Sudan Grass (SSG) Hybrid

Fodder pearl millet-GFB

Job Tears-Coix

Berseem Wardan

Sunflower

গবাদিপশুর ফডার জাতীয় ঘাস

Cow pea

Chicory

Velvetbean

Fodder beet

Hybrid Napier CO 4

Teosinte

Multi cut sweet Sudan grass

Sorghum mixed with cowpea

গবাদিপশুর ফডার জাতীয় ঘাস

Anjan Grass

Barley green fodder

Dhaman Grass

Fodder Mustard – Chinese cabbage

Siratro

Clitoria ternatea (Aparagita) Nandi Grass

গবাদিপশুর ফডার জাতীয় গাছ

Kanchan (Bauhinia purpuria)

Maharukh/Aaradu (Ailanthus excelsa)

Subabul (Leucaena leucocephala)

Gliricidia (Gliricidia sepium)

Khejari (Prosopis cineraria)

Agasthi (Sesbania grandiflora)

Fig (Ficus carica)

Dewa (Artocarpus lacucha)

সেশন-১৩

ডেইরি প্রাণির খাদ্য হিসেবে হাইড্রোপনিক ঘাস এবং এ্যালজি উৎপাদন

(Production of Hydroponic Grass and Algae as Dairy Feed)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ
- হাইড্রোপনিক ঘাসের উপকারিতা
- এ্যালজির পুষ্টিমান ও উৎপাদন পদ্ধতি
- গরুকে এ্যালজি খাওয়ানোর নিয়ম ও উপকারিতা

হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি।

হাইড্রোপনিক ঘাস ঃ বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় বর্তমানে আমাদের দেশেও মাটি বিহীন ঘাস চাষ শুরু হয়েছে। মাটির স্পর্শ ছাড়াই পানির ওপর ফসল উৎপাদনের হাইড্রোপনিক পদ্ধতি আমাদের দেশে অবিস্কার করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ। তাই গোখাদ্যের চাহিদা পূরণে মাটি ছাড়াই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ হতে পারে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের একটি উৎকৃষ্ট কৌশল।

জমিতে ঘাস চাষের প্রচলিত ধারণা বদলে ঘরের ভেতরে মাটি ছাড়া প্লাস্টিক ট্রে এর ভিতর ঘাস বীজ স্থাপন করে কেবল পানি ছিটিয়ে কাঁচা ঘাস উৎপাদনে এই হাইড্রোপনিক ফডার প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে, স্বল্প পরিসরে ও কম খরচে গোখাদ্য উৎপাদন খুবই উপযোগী। এই ঘাসে বাজারের দানাদার ও মাঠের সবুজ ঘাসের প্রায় সব পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। তাই ধীরে ধীরে প্রযুক্তিটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে হাইড্রোপনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুখাদ্য তৈরি খুবই সম্ভাবনাময়। শুধু এই খাদ্য দিয়ে গরু, ছাগল, ভেড়া, খরগোশ ও রাজহাঁস পালন করা সম্ভব।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বীজ হিসেবে গম, ছোলা, খেসারি, ভুট্টা, সয়াবিন, মাষ কলাইসহ বিভিন্ন শস্যের অংকুরোদগম বীজ ব্যবহার করে ঘাস উৎপাদন করা যায়।

হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি (ভূট্টা ঘাস) ঃ প্রথম ভালো মানের ভূট্টার বীজকে ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে ভেজা চটের বস্তা অথবা কালো সুতি কাপড়ের ভেতরে করে ২৪ ঘন্টা অন্ধকার স্থানে রাখতে হয়। শেষে একপাশ ছিদ্র যুক্ত ট্রের ভেতরে পাতলা করে ঐ বীজ বিছিয়ে কালো কাপড় দিয়ে দুই দিন ঢেকে রাখতে হবে। এই দুই দিন খেয়াল রাখতে হয়, বাইরের আলো-বাতাস যেন না লাগে। কাপড়টি সারাক্ষণ ভেজা রাখতে হয়। তৃতীয় দিন কাপড় সরিয়ে আধা ঘন্টা পরপর পানি ছিটাতে হবে। তারপর টিনশেডের একটি ঘরে বাঁশ বা কাঠের তাক বানিয়ে ট্রেগুলো সাজিয়ে রাখতে হয়। এক কেজি বীজ থেকে ৯-১০ দিন পরে ৭ থেকে ৮ কেজি ঘাস পাওয়া যায়। পাঁচ বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করা হয় তা মাত্র ৩০০ বর্গফুটের একটি টিন শেডের ঘরে সেই পরিমাণ হাইড্রোপনিক ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব।

হাইড্রোপনিক ঘাসের উপকারিতা ঃ হাইড্রোপনিক ঘাস গবাদিপশুর জন্য খুবই উপকারী। এই ঘাস পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সুস্বাদু। এই ঘাসে বীজ ও মুল সংযুক্ত থাকে বিধায় এটিকে আঁশ ও দানাদার উভয় প্রকার খাদ্যের সংমিশ্রণে একটি সুষম খাদ্য বলা যায়। এ খাদ্যে প্রচুর পরিমানে পানি থাকে ফলে প্রাণির শরীরের পানিশূণ্যতাও হ্রাস পায়।

প্রচলিত সবুজ ফডার উৎপাদন এবং হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার উৎপাদনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয়তা	প্রচলিত সবুজ ফডার উৎপাদন	হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার উৎপাদন	তুলনামূলক সুবিধা
১.	আয়তন	১০০০ ব.মি.	৫০ ব.মি.	কম পরিমান জমি
২.	ফডার উৎপাদন সময় (দিন)	৬০-৭০ দিন	৭দিন	কম সময়
৩.	পানি ও বিদ্যুৎ খরচ	খুব বেশী	খুব কম	কম পানি ও বিদ্যুৎ
৪.	জমির উর্বরতা	জরুরী	জরুরী নয়	জমির উর্বরতা শক্তি
৫.	সার	প্রয়োজন	প্রয়োজন নয়	কম সার
৬.	ফডারের উৎপাদন নির্ভরতা	প্রাকৃতিক বৃষ্টি, পানি নির্ভর	নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ	নির্ভরতা কম
৭.	প্রাণির ফডার গ্রহণ	আংশিক	সম্পূর্ন	কম অপচয়
৮.	শ্রম ব্যাবহার	বেশী	কম	শ্রম সাশ্রয়ী
৯.	প্লট ঘেরা ও নিরাপত্তা	প্রয়োজন হয়	প্রয়োজন হয় না	ঘেরা খরচ কম
১০.	ফডার খাবার অভ্যাস	কেটে টুকরা করে	প্রয়োজন হয় না	গময় ও শ্রম সাশ্রয়ী

হাইড্রোপনিক ঘাসের পুষ্টিমান ঃ

পুষ্টি উপাদান (%)	প্রচলিত সবুজ ফডার (ভুট্টা)	হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার (ভুট্টা)
প্রোটিন	১০.৬৭	১৩.৫৭
ইথার এক্সট্রাক্ট (ফ্যাট)	২.২৭	৩.৪৯
ক্রুড ফাইবার (আঁশ)	২৫.৯২	১৪.০৭
নাইট্রোজেন মুক্ত এক্সট্র্যাক্ট	৫১.৭৮	৬৬.৭২
মোট অ্যাশ (খনিজ)	৯.৩৬	৩.৮৪

গো-খাদ্য হিসেবে এ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার ঃ

এ্যালজি এক ধরনের এককোষী উদ্ভিদ যা পুষ্টিকর গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে। আমাদের দেশে সাধারনত: দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজি ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস চাষ করা হয়ে থাকে।

এ্যালজির পুষ্টিমান ঃ বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর প্রাণিখাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন থাকে, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়া ভিটামিন-এ, বি, সি, ই এবং কে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। রোমন্থনকারী প্রাণিতে (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) এ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

এ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ এ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবয়েলের পরিস্কার পানি, মাসকলাই বা অন্যান্য ডালের ভূষি এবং ইউরিয়া।

- প্রথমে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর তৈরী করতে হবে। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরী হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি

স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও এ্যালজি চাষ করা যায়।

- ১০০ গ্রাম মাসকলাই (বা অন্য ডালের) ভূষিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত: তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ টিউবওয়েলের পরিস্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমান এ্যালজির বীজ, যা এ্যালজির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকেলে কমপক্ষে তিনবার এ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মত পরিস্কার পানি যোগ করতে হয়।
- এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে এ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় এ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। এ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- একটি পুকুরের এ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মত পানি, সার, এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে এ্যালজি বীজ দিতে হয় না।
- যখন এ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামী রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

গরুকে এ্যালজি খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ এ্যালজির পানি সব বয়সের গরুকে খাওয়ানো যায়। এ্যালজি খাওয়ানোর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত: দুই এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত: তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের একটি গরু ১২ কেজি পরিমান এ্যালজির পানি পান করতে পারে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। এ্যালজি শুকিয়ে সংরক্ষণ করেও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারীতা ঃ রোমন্থনকারী প্রাণি যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে ঘাস বা খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল মানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মত প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজযুক্ত খাবার খায় তা হলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় ফলে গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তি সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন-খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে এ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ্যালজি খাওয়ালে আমিষ জাতীয় দানাদার খাদ্য কম লাগে এতে গবাদিপশু পালনে খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

সেশন-১৪

ডেইরি প্রাণির পরিচর্যা এবং খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রম

(Care of Animals and Routine Works in a Dairy Farm)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা
- ৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর ওজন ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য চাহিদা
- প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচযা
- প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা
- একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের সময়সূচি

খামারে ডেইরি প্রাণির যত্ন ও পরিচর্যা ঃ

গাভী থেকে সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে প্রজননের পর থেকে শুরু করে বাচ্চা প্রসবের পর পর্যন্ত সময়টুকুতে সঠিক যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে গাভী ও বাছুরের মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে গাভী পালন লাভজনক না হয়ে লোকসানে পর্যবসিত হতে পারে।

ক) গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা (Care and management of cow during pregnancy) ঃ

গাভীর গর্ভধারণকাল গড়ে ২৮০ দিন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই পাল দেওয়া হোক না কেনো কখন পাল দেওয়া হয়েছে সেই সময়টি মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি গাভীর স্বাস্থ্যরেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গাভী গর্ভধারণ করেছে কিনা এই বিষয়টিও নিশ্চিত হতে হবে। দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ৬ মাস পর্যন্ত যত্ন, পরিচর্যা, খাদ্য সরবরাহ ও দুধ দোহন স্বাভাবিকভাবেই চলবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক খাদ্যের অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হলে ০.৫-১.০ কেজি, ৩০০-৪০০ কেজি হলে ১.০-১.৫ কেজি এবং ৪০০-৫০০ কেজি হলে ১.৫-২.৭৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ দিতে হবে। বয়সভেদে অতিরিক্ত এই খাদ্য চাহিদাকে প্রেগ্‌নেন্সি এ্যালাউন্স (Pregnancy allowance) বলে।

গর্ভবতী গাভীকে এই বয়সে খাদ্য প্রদানে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো- (ক) গাভীর কোনভাবেই চর্বি জমতে দেওয়া যাবে না এবং (খ) দানাদার মিশ্রণের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে বকনা বাছুরের ক্ষেত্রে পাল দেওয়ার পর থেকেই সুষম খাদ্য সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত। কারণ এই সময় গর্ভের বাচ্চা ও বকনা বাছুরের শরীরের বৃদ্ধি একই সাথে ঘটে থাকে। গর্ভবতী বকনা বা গাভীকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় বকনা/গাভী যেনো প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার পানি খেতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন ওলান ফুলে যায়, ভালভা যোনীমুখ স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে।

প্রসবের প্রায় দু'সপ্তাহ পূর্ব থেকে বকনা বা গাভীকে একটু বড় ধরনের ঘরে পৃথকভাবে খোলা অবস্থায় রাখতে হবে। প্রতিদিন হাঁটাচলার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষ্কার নরম বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে গর্ভাবস্থায় যেন কোনোভাবেই বকনা বা গাভী উত্তেজিত না হয় বা আঘাত না পায়। গরম হওয়া গাভী বা ষাঁড় যেন গর্ভবতী বকনা বা গাভীর উপর লাফ না দেয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময় বকনা বা গাভীর খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিতে হবে। পায়খানা পরিষ্কার ও শরীর ঠান্ডা থাকে এ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর ওজন ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য চাহিদা ঃ

ওজন ও দুধ উৎপাদনের		দৈনিক খাদ্য চাহিদা (কেজি)			
গাভীর ওজন	দুধ উৎপাদন	আঁশ জাতীয় খাদ্য		দানাদার খাদ্য	
(কেজি)	(কেজি)	(কাঁচা ঘাস/খড়)			
		গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী
			৬ মাসের অধিক		৬ মাসের অধিক
৩০০	২.০	৩৬.০/৯০	৩০.০/৭.৫০	১.০০	১.৫০
৪০০	২.০	৪.০/১.০	৩৬.০/৯.০	২.০০	৩.৫০

কাঁচা ঘাস এবং শুকনো খড়ের মিশ্রণ আনুপাতিক হারে সরবরাহ করতে হবে। সাধারণত চার কেজি কাঁচা ঘাস মোটামুটিভাবে এক কেজি শুকনো খড়ের সমতূল্য।

দানাদার মিশ্রণ সব সময় সহজ লভ্য ও সস্তা খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে এ জন্য পুষ্টি মাত্রার ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ব্যবহারিক মাত্রার একটি হিসাব নিচে দেয়া হলো।

	খাদ্যের নাম	গঠন (শতকরা হার)
ক.	দানাদার খাদ্য (গম/ভূট্টা/খেসারি ভাংগা)	১৫-২৫
খ	ভূষি ও কুড়া (গম/চাল/খেসারি)	৪৫-৫৫
গ.	খৈল (তিল/নারিকেল/তুলা বীজ)	১৫-২০
ঘ.	মাছের গুড়া/সয়াবিন মিল	৪-৫
ঙ.	খনিজ ও লবণ (লবণ ১.০% এবং হাড়ের গুড়া/লাইম স্টোন পাউডার/ঝিনুকের	৪-৫
চ.	পাউডার/ডিমের খোসার পাউডার ইত্যাদি)	৩-৪

প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা (Care and management of cow during parturition) ঃ

- বাচ্চা প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।
- গাভীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই গাভীকে হালকা গরম পানি বা এধরনের পানি দিয়ে গুড়ের সরবত তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।
- গাভী যাতে নবজাতক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।
- প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।
- সাধারণত প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। যদি ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও গর্ভফুল বের না হয় তবে গাভীকে আরগট মিশ্রণ (Ergot mixture) খাওয়ানো যেতে পারে। ১২ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী যেনো গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- দুধজ্বর ও ম্যাস্টাইটিস রোগের সম্ভাবনা কমাবার জন্য বাচ্চা প্রসবের পর ১-২ দিন পর্যন্ত গাভীকে সম্পূর্ণভাবে দোহন না করাই ভালো। বাছুরকে কাচলা দুধ বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।
- গাভীকে প্রথমত হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একইসাথে অল্পপরিমাণ কাঁচা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের সময়সূচি ঃ

একটি দুগ্ধ খামারে সারা বছর ধরে রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ইপ্সিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব। খামারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ কাজে অংশগ্রহন করা অতীব জরুরী। খামার ব্যবস্থাপক দৈনিক রুটিন মাফিক কাজের তালিকা প্রণয়ন করে দায়িত্ব বন্টন করেবেন এবং কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে কিনা তার তদারকী করবেন। সকল কাজ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় খামারের কর্মচারীরা সম্পাদন করবেন। একটি খামারে নিম্নলিখিত মূলকার্যাদি প্রতিদিন রুটিন মাফিক করা প্রয়োজন।

সময়	কার্যাবলি
ভোর ৪.০০-৪.৩০	দুধ দোহনের ঘর পরিষ্কার করা এবং দুগ্ধবর্তী গাভীকে গোসল করা।
ভোর ৪.৩০-৫.৩০	প্রতিদিনের মোট প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের মিশ্রণের অর্ধেক পরিমাণ গাভীকে সরবরাহ করা।
ভোর ৫.৩০-৬.৩০	দুধ দোহন। উৎপাদিত দুধের রেকর্ড রাখা। তরল দুধ ভোক্তাদের মাঝে পিক-আপ ভ্যানের মাধ্যমে বিতরণ এবং পূর্বের খালি দুধের পাত্র সংগ্রহ করা।
সকাল ৬.৩০-৭.৩০	গাভী শুষ্ক ঘরে স্থানান্তর করা। উল্লেখ্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারী শ্রমিক এবং গোয়ালা সকাল ৭.০০ ঘটিকা কাজ শেষ করবে। খামারের শ্রমিক এবং এটেন্ডেন্ট সকাল ৭.০০ টায় কাজ শুরু করবে। খামারের শ্রমিকরা ঘাস চাষের জমিতে সকাল ৭.০০ হতে বিকাল ৩.৩০ টা পর্যন্ত কাজ করবে।
সকাল ৭.৩০-১১.০০	ব্যায়াম, গাভী গরম হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ এবং সূর্য কিরণ হতে ভিটামিন গ্রহণের লক্ষ্যে গাভীগুলোকে মাঠে চড়াতে হবে। অন্যান্য কার্যাদি যেমনঃ বাছুরের মার্কিং, শিং ছেদন, প্রতিষেধক টিকা প্রদান, সাইলেজ এবং হে তৈরিকরণ ইত্যাদি এ সময় করতে হবে।
সকাল ১১.০০-১২.০০	গাভীগুলো মাঠ থেকে এনে ঘরে আবদ্ধ করতে হবে। দুগ্ধবতী গাভী ছাড়া সব পশুকে দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। সাথে আঁশ-জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
দুপুর ১২.০০-১.৫০	খামার শ্রমিকদের দুপুরের খাবার ও বিশ্রাম।
দুপুর ১.৩০-২.৩০	খামার এটেনডেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে- স্টক আইডেন্টিফিকেশন, রুটিন টিকা প্রদান, দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরিকরণ, উৎপাদিত গোবর সংরক্ষণ, খামারের যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ।
বিকাল ২.৩০-৩.৩০	পুনরায় দুগ্ধবর্তী গাভীকে গোসল করানো, দুধের ঘর ধোয়া ও পরিষ্কারকরণ।
বিকাল ৩.০০-৪.০০	বাকি অর্ধেক দানাদার খাদ্য দুগ্ধবর্তী গাভীকে সরবরাহ করা এবং দুধ দোহনের কাজ করা।
বিকাল ৪.০০-৫.০০	খামারের সব পশুকে আঁশ যুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা। পিক আপ ভ্যানের মাধ্যমে উৎপাদিত তরল দুধ ভোক্তাদের নিকটবিতরণ, খালি দুধের পাত্র সংগ্রহ ও এর পরিষ্কারকরণ।
বিকাল ৫.০০-৫.৩০	খামারে আলো সরবরাহকরণ।
বিকাল ৫.৩০ হতে সন্ধ্যা ৬.০০	খামারের সব শ্রমিক এবং গোয়ালা তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। দুগ্ধবর্তী গাভী ছাড়া অন্যান্য পশু নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ করা এবং আঁশ যুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা।
সন্ধা ৬.০০ হতে সকাল ৬.০০	নৈশ প্রহরি দায়িত্ব পালন করবে।

সেশন-১৫

ডেইরি প্রাণির পরিষ্কার দুধ দোহন, শীতলীকরণ ও পরিবহন

(Clean Milking, Cooling, and Transportation in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গাভীর পরিষ্কার দুধ দোহন পদ্ধতি
- দোহনের পর দুধ শীতলীকরণ
- কাঁচা দুধের গুণমান পরীক্ষা
- প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় দুধ পরিবহন

একটি সুস্থ ওলান থেকে দুধ নি:শৃত হয় তখন তা জীবানুমুক্ত থাকে। এটি পুষ্টিতে ভরপুর এবং দোহনের পর এটি মাইক্রোবায়াল বৃদ্ধির জন্য একটি উত্তম মিডিয়াতে পরিণত হয়। জীবাণুর মাধ্যমে দুধের পচন বা দূষণ সম্ভাবনা হ্রাস করতে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত দুধ উৎপাদন অতি আবশ্যক।

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ 'আদর্শ খাদ্য' দুধ। কিন্তু এ দুধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অতি সহজে দূষিত হয়ে পড়ে। দুধ দোহন পদ্ধতিই এর প্রধান কারণ এবং দোহনের সময়ই অসংখ্য ক্ষতিকর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ে। দুধে জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দুধের পুষ্টিমান অতি সহজেই নষ্ট করে ফেলে। তাই দুধ দোহনের সময় যত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা যায় তত বেশী মানসম্মত দুধ পাওয়া যায়।

পরিষ্কার দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া (Procedure of Clean Milk Production) ঃ

দুধ মানুষের প্রধান পুষ্টিকর ও আমিষ জাতীয় খাদ্য পণ্য। ডেইরি খামারি/ ব্যবস্থাপক এর প্রধান লক্ষ্য তাঁর গাভী থেকে দুধের সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া। একই সাথে তাঁকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, দুধ হবে পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যসম্মত যাতে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ হয়।

জনগণের স্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ থেকে, দুধ ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবের বিকাশের জন্য খুব ভাল মিডিয়া। এই হিসাবে, দুধ উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনের সময় সংক্রমিত দুধ জড়িত ব্যাক্তি এবং জনসাধারণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

পরিষ্কার দুধের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ময়লা, ধূলাবালি, লোম, খড় কুটা ও অন্যান্য লতাপাতা থেকে মুক্ত
- অস্বাভাবিক গন্ধ মুক্ত
- ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় কম
- অ্যান্টিবায়োটিক এবং রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ মুক্ত
- দুধের স্বাভাবিক গঠন এবং অম্লতা সঠিক থাকা

দুধ দোহন কৌশল (Milking) ঃ

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাকে দুধ দোহন বলে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে গাভী থেকে দ্রুত দুধ দোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে গাভী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

দুধ দোহনের সময় (Time of milking) ঃ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিদিন দু'বার বা তিনবার দুধ দোহন করা উচিত। যখন তখন দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন কমে যায়।

দুধ দোহন ক্রম (Milking order) ঃ কোনো দলে একের অধিক গাভী থাকলে নিচের ক্রম অনুযায়ী দুধ দোহন করা উচিত।
১ম- ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত অল্প বয়স্ক গাভী। ২য়- ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত বয়স্ক গাভী।
৩য়-যে সমস্ত গাভীর পূর্বে ম্যাস্টাইটিস রোগ হয়েছিলো কিন্তু তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ম্যাস্টাইটিস রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি

দুধ দোহনের বিভিন্ন ধাপ (Steps for milking) ঃ

সঠিকভাবে দুধ দোহন সম্পন্ন করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়–

ধাপ-১. **গাভী এবং দোহনকারীকে প্রস্তুত করা (Preparing the cow and milker) ঃ**

দোহনকারী ও যে গাভীর দুধ সংগ্রহ করা হবে এদের মধ্যে পারস্পরিক পছন্দ থাকা উচিত। দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে বিরক্ত করা উচিত নয় অথবা আঘাত করা উচিত নয়। দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান এবং বাঁট অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন অথবা নিমপাতার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে । এরপর দোহনকারীকে তার হাত সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং দোহনের জন্য পৃথক পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে, তোয়ালে বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং নিয়মিত হাতের নখ কাটতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর যদি কোনো বদভ্যাস যেমন– মুখ থেকে থুতু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি দোহনের সময় কথা বলা ইত্যাদি থাকে তাহলে ঐ দোহনকারীকে দিয়ে দুধ দোহন করানো উচিত নয়।

ধাপ-২. **পরিষ্কার তৈজসপত্র ব্যবহার করা (Use of clean utensils) ঃ**

দুধ সংগ্রহরে জন্য প্লাস্টিক বা লোহার বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা স্টেইনলেস ষ্টিলের বালতি ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেকবার দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত র‍্যাকে পাত্রগুলো উপুড় করে সাজিয়ে রাখতে হবে।

ধাপ-৩. **মশামাছির আক্রমণ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখা (Keep cows free from flies etc.) ঃ**

দোহনের সময় মশা মাছি বা কোনো বিকট শব্দের ফলে গাভী যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সবসময় পরিস্কার স্থানে দুধ দোহন করতে হবে।

ধাপ-৪. **গাভীকে উদ্দীপিত করা (Stimulation of cows) ঃ**

বাছুরের সাহায্যে গাভীর বাঁট চুষে অথবা দোহনকারী কর্তৃক ওলান ম্যাসেজ করে গাভীকে উদ্দীপিত করতে হবে। দোহন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, দুধ যেনো সম্পূর্ণভাবে দোহন করা হয়।

ধাপ-৫. **দোহনের সময় খাওয়ানো (Feeding during milking) ঃ** দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণ দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো ভালো। এতে করে গাভী খেতে ব্যস্ত থাকে এবং সহজে দুধ দোহন করা যায়।

স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা (Using strip cup) ঃ গাভী ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা হয়। দোহনের শুরুতেই প্রতিটি বাট থেকে এক থেকে দুই ফোঁটা দুধ স্ট্রিপ কাপে নেয়া হয়। এতে করে দুধে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তা দোহনকারী বুঝতে পারে এবং পাশাপাশি বাঁটে কোনো ময়লা থাকলে তা বের হয়ে আসে।

দুধ দোহন পদ্ধতি (Milking procedure) ঃ

দুধ দোহন হল দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুধ দোহন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুগ্ধগ্রন্থি হতে দুধ নিঃসরণ করা হয়, যা হাত দ্বারা অথবা মেশিনের সাহায্যে করা যায়।

দুধ দোহনের দুটো পদ্ধতি রয়েছে–

১. হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand milking) ২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine milking)

হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand milking) ঃ

মূলনীতি ঃ হাতের সাহায্যে দুধের বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করলে ওলানের ভিতরের দুধের উপর চাপ পড়ে। যখন চাপ অপসারণ করা হয় তখন ওলানের দুধ বাঁটে চলে আসে। আবার যখন বাঁটে চাপ দেয়া হয় তখন একই সাথে দুধ নিচের পাত্রে জমা হয় এবং ওলানের ভিতরও চাপ পড়ে। এভাবে দুধ দোহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। হাত দ্বারা দুধ দোহন তিন ভাবে হতে পারে-

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন (খ) নোড দ্বারা দোহন (গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর ওলানের গঠন ভাল এবং বাঁটগুলি পরিমিত আকারের ধরা হয় যাতে ছোট আঙ্গুলের অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। এভাবে বাঁট ধরে বার বার মুঠো খোলা এবং বন্ধের মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

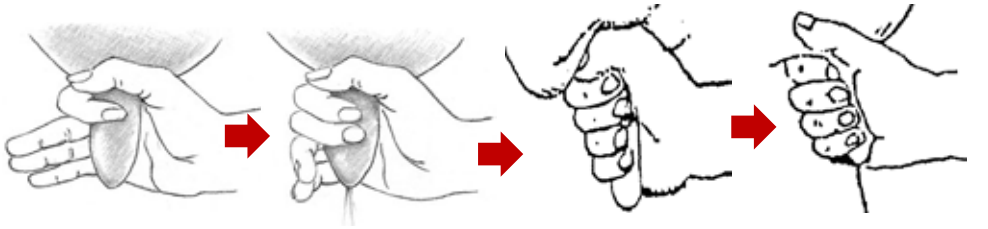

(খ) নোড দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট মোটা ও মাংসল, সে সমস্ত গাভী দোহনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্ধভাগ এবং প্রথম আঙ্গুল দ্বারা বাঁটকে এমনভাবে ধরা হয় যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে বাঁটে চাপ প্রয়োগ করা যায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বার বার চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

(গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট ছোট, সে সমস্ত গাভী এ পদ্ধতিতে দোহনের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং প্রথম আঙ্গুল এর অগ্রভাগ দিয়ে বাঁট ধরা হয়। দু আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগসহ উপরে-নিচে করে দুধ দোহন করতে হয়।

২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine milking) ঃ

সাধারণত বড় বড় খামারে যেখানে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেখানে একসংগে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দুধ দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজে এবং অল্প পরিশ্রমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়। একটি দুধ দোহন যন্ত্রে সাধারণত যে অংশগুলো থাকে-

১. ভ্যাকুয়াম পাম্প ২. ভ্যাকুয়াম ট্যাংক ৩. ভ্যাকুয়াম লাইন ৪. রেগুলেটর ৫. পালসেটর ৬. মিল্ক পাইপ ৭. এয়ার পাইপ ৮. টিট কাপ ৯. দুধ সংগ্রহ পাত্র

যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন পদ্ধতিতে দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে যন্ত্রের টিট কাপ লাগিয়ে দিয়ে দোহন যন্ত্রটি চালু করতে হবে। (চিত্র-২) ভ্যাকুয়াম পাম্প কর্তৃক সৃষ্ট ভ্যাকুয়াম পালসেটরের মাধ্যমে টিট কাপ শেল ও টিট কাপ লাইনারের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে ওলান থেকে দুধ এসে বাঁটে জমা হয় (চিত্র-৩)। আবার টিট কাপ সেল ও লাইনারের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে স্ফীতির সৃষ্টি করলে বাঁটের উপর চাপ পড়ে এবং বাঁটে রক্ষিত দুধ যন্ত্রের মিল্ক পাইপ দিয়ে দুধ সংগ্রহ পাত্রে এসে জমা হয় (চিত্র-৩)।

দুধ দূষণের কারণ ঃ

ক) গাভী থেকে ঃ

১) গাভী রোগাক্রান্ত হলে বা ওলানের রোগ জীবানু থেকে দুধে জীবানু সংক্রমিত হতে পারে।
২) বাটের আলসার বা ঘাঁ হতে দুধ দূষিত হতে পারে।
৩) গাভীর মল-মূত্র বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দ্বারা দুধে জীবাণু ছড়াতে পারে।

খ) দোহনকারী বা পরিচর্যাকারী থেকে ঃ

১) দুধ দোহন কালে বা দুধ পরিবহণ করার সময় দুধ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। ২) দোহনকারীর হাত অপরিস্কার থাকলে অথবা হাতের নখ কাটা না থাকলে নখের ময়লা দ্বারা দুধ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।
৪) দূষিত পানি দ্বারা দুধ দোহন যন্ত্রপাতি বা দোহনকারীর হাত পরিস্কার করলে সেই পানি থেকে দুধে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

গ) দুধ দোহন যন্ত্রপাতি থেকে ঃ

দুধ দোহন কালে অপরিষ্কার পাত্র এবং দোহন যন্ত্র পাতি বা দুধ পরিবহণ করার সময় অপরিষ্কার পাত্রের মাধ্যমে দুধে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।
ঘ) দুধ দোহন স্থানের নোংরা পরিবেশ থেকে ঃ
১) দুধ দোহন স্থানের পরিবেশ নোংরা এবং দুর্দন্ধযুক্ত হলে জীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা খাকে।
২) দুধ সংগ্রহের সময় দুধের পাত্র ঢেকে না রাখলে বাহির রোগ জীবাণু দুধে প্রবেশ করতে পারে।
৩) মাছি বা পোকা মাকরের মাধ্যমে দুধে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।
৪) দুধকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা না হলে সহজেই দুধ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

খামারে কাঁচা দুধের গুণমান পরীক্ষা (Raw Milk quality Test/Platform Test) ঃ

প্রক্রিয়াকরনের জন্য কাঁচা দুধের গুণমান পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে চারটি সহজ টেষ্ট করা হয়। এগুলিকে একত্রে প্লাটফর্ম টেষ্ট বলা হয়।
১) অর্গনোলেপটিক পরীক্ষা (Organileptic Test)
২) ক্লট-অন-বয়েলিং পরীক্ষা (Clot on Boiling Test)
৩) অ্যালকোহল পরীক্ষা (Alcoholic Test)
৪) ল্যাকটোমিটার পরীক্ষা (Lactometer Test)
এই পরীক্ষাগুলি গ্রহণযোগ্য মানের দুধ নিশ্চিত করে। কাঁচা দুধ পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি নীচে বর্ননা করা হলো :

১) অর্গানোলেপটিক পরীক্ষা

এই পরীক্ষাটি প্রথম করা উচিত এবং এটির সাথে দুধের মূল্যায়ন জড়িত। এটি গন্ধ, অবস্থা এবং রঙ সম্পর্কিত। এই পরীক্ষাটি দুর্বল মানের দুধ চিহ্নিত করে।

কার্যপ্রণালী ঃ

- দুধের একটি ক্যান খুলুন।
- সঙ্গে সঙ্গে দুধের গন্ধ নিন এবং গন্ধের প্রকৃতি এবং তীব্রতা অনুভব করুন, যদি দুধে কিছুটা টক থেকে গন্ধযুক্ত বা পেইন্ট বা প্যারাফিনের মতো গন্ধ থাকলে দুধ গ্রহণ করা হবে না।
- দুধের রঙ পর্যবেক্ষণ করুন। স্বাভাবিক দুধের হলুদ-সাদা বর্ণের বিচ্যুতি যেমন লালচে রক্ত বা হলুদ পুঁজ ওলানের ক্ষত নির্দেশ করে।
- দুধের মধ্যে কোনও বাহ্যিক বস্তু বা ময়লা ইঙ্গিত দেয় যে দুধ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে দোহন বা পরিবহন করা হয়নি।
- দুধের পাত্র টাটকা গরম বা শীতল কিনা তা অনুভব করতে স্পর্শ করুন। এটি ইঙ্গিত করে যে দুধ দোহনের পরে কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়েছে (ঠান্ডা না হলে) এবং যা ভেজালের জন্য ল্যাকটোমিটার পরীক্ষায় প্রভাব ফেলবে।

২) ক্লট-অন-বয়েলিং পরীক্ষা

এই পরীক্ষাটি দ্রুত এবং সহজে করা যায়। এটি দুধ সনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি যা কাঁচা দুধ শীতল না করে খুব বেশি সময় ধরে রাখা হয়েছিল এবং দুধে উচ্চ অম্লতা বা কোলোস্ট্রামে প্রোটিনের উচ্চ হার ইঙ্গিত করে।

কার্যপ্রণালী ঃ

- এক চামচে বা টেষ্টটিউবে বা অন্যান্য উপযুক্ত পাত্রে অল্প পরিমাণে দুধ নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আগুনে ফুটান।

- জমাট বাঁধার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করুন।
- যদি দুধ জমাট বাঁধা বা জমাটভাব হলে বা অধ:ক্ষিপ্ত থাকলে দুধ প্রত্যাখান করতে হবে।

৩) অ্যালকোহল পরীক্ষা

পরীক্ষাটি দ্রুত এবং সহজ। এ পরীক্ষায় অ্যালকোহল ইথানল ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষাটি অম্লতার নিম্ন স্তরের প্রতি বেশি সংবেদনশীল যা খারাপ দুধ সনাক্ত করতে পারে যা আগের দুটি পরীক্ষায় চিহ্নিত করা যায় নাই। এটি দুধ শীতল না করে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ বা দুধে কোলস্ট্রামের উপস্থিতি বা মাস্টাইটিসে আক্রান্ত গাভীর দুধ সনাক্ত করে।

কার্যপ্রণালী ঃ

- সম পরিমাণে দুধ এবং ৭০% অ্যালকোহল দ্রবণ নিতে একটি সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন।
- একটি ছোট টিউব বা কাঁচের কাপ নিতে হবে।
- কাঁচের পাত্রে সিরিঞ্জ দিয়ে ২ মিলি দুধ, ২ মিলি ৭০% অ্যালকোহলের সাথে মিশ্রিত করুন এবং জমাট বাঁধার জন্য পর্যবেক্ষণ করুন।
- যদি পরীক্ষিত দুধের নমুনা জমাট বাঁধে বা অধ:ক্ষিপ্ত থাকে তবে দুধ প্রত্যাখাত হবে।

৪) ল্যাকটোমিটার পরীক্ষা

স্বাভাবিক দুধে পানি বা ঘন বস্তু মিশ্রিত করে ভেজাল দেয়া হয়েছে কিনা তা নির্দ্ধারন করতে এই পরীক্ষাটি করা হয়। দুধের সাথে যে কোনও কিছু সংযোজন ব্যাকটিরিয়ার প্রবর্তন করতে পারে যা এটি দ্রুত নষ্ট করবে, এটি অসৎ প্রক্রিয়া এবং অবৈধ। পানির (১.০০০ গ্রাম / মিলি) তুলনায় দুধের ওজন বা ঘনত্ব (১.০২৬-১.০৩২ গ্রাম / মিলি) বেশী। যখন দুধে পানি যোগ করা হয় তখন দুধের ঘনত্ব হ্রাস পায় এবং যখন সলিড বস্তু যোগ করা হয় তখন দুধের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। দুধে যদি দুধের ফ্যাট (ক্রিম) যুক্ত করা হয় তবে ঘনত্ব হ্রাস পায়।

দুধের ঘনত্ব পরিমাপ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রকে ল্যাকটোমিটার বলা হয়। বেশিরভাগ ল্যাকটোমিটার সাধারণত ০ (১.০০০ গ্রাম/মিলি এর ঘনত্ব উপস্থাপন করে) থেকে ৪০ (১.০৪০ গ্রাম/মিলি এর ঘনত্ব উপস্থাপন করে) পর্যন্ত চিহ্নিত করা থাকে।

কার্যপ্রণালী ঃ

- ঘরের তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য দুধ ঠান্ডা হতে দিন এবং এটির তাপমাত্রা প্রায় ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- দুধের নমুনাটি নাড়াচাড়া করুন এবং ২০০ মিলি মাপের সিলিন্ডার বা ল্যাকটোমিটারের দৈর্ঘ্যের চেয়ে গভীরতর কোনও পাত্রে আলতো করে ঢেলে দিন।
- ল্যাকটোমিটারটি দুধে আস্তে আস্তে ডুবতে দিন।
- দুধের পৃষ্ঠের ঠিক উপরে ল্যাকটোমিটার মাপ বা রিডিং নিন।।

Calculate the true lactometer readings when the milk temperature differs from the calibration temperature of 20°C

Milk temperature °C	Observed lactometer reading °L	Correction °L	True lactometer reading °L	True density g/ml
17	30.6	- 0.6	30.0	1.030
20	30.0	nil	30.0	1.030
23	29.4	+ 0.6	30.0	1.030

দুধ যদি স্বাভাবিক থাকে তবে এর ল্যাকটোমিটার রিডিং এর পরিমাণ ২৬ থেকে ৩২ এর মধ্যে হবে। যদি ল্যাকটোমটার রিডিং ২৬ এর নীচে বা ৩২ এর উপরে হয়, তবে দুধ প্রত্যাখ্যান করা হবে কারণ এর অর্থ এটিতে পানি যুক্ত করা বা ঘন বস্তু মিশ্রিত করা হয়েছে।

অর্গানোলেপটিক পরীক্ষা

ক্লট-অন-বয়েলিং পরীক্ষা

অ্যালকোহল পরীক্ষা

ল্যাকটোমিটার পরীক্ষা

খামারে পরিষ্কার ও স্বাস্থসম্মত দুধ উৎপাদনে খামাফর/খামার ব্যবস্থাপক নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন-

- দুধ সব সময় পরিষ্কার ও শুষ্ক স্থানে দোহন করতে হবে। দুর্গন্ধ, মশা-মাছি মুক্ত হতে হবে।
- দুধ দোহন প্রাত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবানমুক্ত রাখতে হবে। দোহন পাত্র ও যন্পাতি ষ্টেইনলেস ষ্টিলের হতে হবে।
- দোহনকারীকে সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হতে হবে এবং দোহনের পূর্বে পোষাক পরিবর্তন ও হাত মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দোহনের সময় মাথায় ক্যাপ ও মুখে মাস্ক পড়তে হবে।
- দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান ও পশ্চাতদেশ ভালভাবে সাবান বা জীবানুনাশক লাগিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। গাভীকে প্রতিদিন গোসল করানো উচিত।
- দোহনের সময় স্ট্রিপ কাপ বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে মাস্টাইটিস পরীক্ষা করতে হবে।
- অসুস্থ প্রাণির দুধ দোহন শেষে করতে হবে। (তাদের দুধ ভাল দুধের সাথে মিশ্রিত করা উচিত নয়)।
- দুধ দোহন শেষে কাঁচা দুধ পরিষ্কার ফিল্টার কাপড় দিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার ঢাকনাযুক্ত এ্যলুমিনিয়াম ক্যানে রেখে দ্রুত ছায়াযুক্ত বা কুল রুমে স্থানান্তর করতে হবে।
- দুধ দোহন শেষে দুধ দোহনে ব্যবহৃত স্থান ও সকল পাত্র ও যন্ত্র পাতি ডিটারজেন্ট ও গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে দুধ সংকরক্ষণ ও পক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা না থাকলে দ্রুত প্রাক্রিয়াকরন প্লান্টে প্রেরন করতে হবে।

দোহনের পর দুধ শীতলীকরণ ঃ

দুধ সংরক্ষণ ঃ সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধকে খাদ্যোপযোগী এবং পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দুধ দোহনের পর যত দ্রুত সম্ভব তা শীতলীকরণ করা উচিৎ এবং প্রক্রিয়াকরনের পূর্ব সময় পর্যন্ত তা সেই তাপমাত্রায় রাখা উচিৎ। শীতলীকরণের জন্য সবথেকে ভাল তাপমাত্রা হচ্ছে ৪ ডিগ্রি সে. অথবা তার নিচে।

গুরুত্বপূর্ণ শীতলীকরণ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১. দুধ সূর্যের আলোতে না রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা

২. আলো বাতাস পূর্ণ স্থানে রাখা

৩. বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা বা কোল্ড রুমে রাখা

দুধ সংরক্ষণের লাকটোপারঅক্সিডেস পদ্ধতি :

১. এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি ।

২. প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে দুধ নিয়ে যেতে যখন অনেক সময় লাগে তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৩. শীতলীকরণ সুবিধা যেখানে নেই সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৪. যেখান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয় সেখানে প্রশিক্ষিত জনবল দরকার।

৫. লাকটোপারঅক্সিডেস এক ধরনের এনজাইম যা দুধ নষ্ট করার জীবাণু-এর বংশ বৃদ্ধির গতি ধীর করে দেয়।

৬. এর কার্যক্ষমতা তাপমাত্রা এর উপর নির্ভর করে। তবে ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় এটা দুধকে ৭-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাল রাখে।

প্রক্রিয়াকরন প্লান্টে কাঁচা দুধ পরিবহন ঃ

দোহনের পর কাঁচা দুধ যত দ্রুত সম্ভব ৪-৫ ডিগ্রী সে. তাপমাক্রায় শীতলীকরন করতে হবে। এ অবস্থায় সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়। এরপর দ্রুত কুল ভ্যান বা ট্যাংকারে করে প্রক্রিয়াকরন প্লান্টে প্রেরণ করতে হবে। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টগুলি সাধারনত; চুক্তিবদ্ধ খামার এবং তাদের নিজস্ব দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি থেকে সরাসরি কুল ভ্যান বা ট্যাংকারে করে প্রসেসিং প্লান্টে কাঁচা দুধ পরিবহন করে থাকে। দুধ পরিবহন কালে দুধের ক্যান, বালতি, ট্যাংকার ইত্যাদি পরিষ্কার ও জীবানমুক্ত হতে হবে। কাঁচা দুধ খুব সকালে বা বিকালে পরিবহন করা শ্রেয় বিশেষ করে কুল ভ্যান ছাড়া দুধ পরিবহনের ক্ষেত্রে।

দুধ পরিবহন কালে নিম্ন বর্নিত সর্তকতা অনুসরণ করা আবশ্যক ঃ

- দোহন সম্পন্ন করার পর ছাকনি দিয়ে পরিস্কার পাত্রে দুধ ছেকে নিতে হবে। কোন প্রকার লোম, পোকা বা ময়লা থাকলে তা সরিয়ে নিতে হবে।
- দুধ যত সত্বর বিক্রয়/সংগ্রহ কেন্দ্রে নেয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। দুধের পাত্রটি বেশী নাড়াচাড়া যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বেশী নাড়াচাড়া হলে এবং ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে দুধ প্রক্রিয়াজাত না হলে দুধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- কন্টেইনার বা মুখ ছোট আকৃতির পাত্রে দুধ পরিবহন করা উচিত নয়। কারণ তাতে পাত্র পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয়।
- পৃথকভাবে সরবরাহকৃত দুধ সাধারনত একত্র করে দলভত্তিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে পরিবহন করা হয়।
- পরিবহনের কাজে মিল্ক ভ্যান, ট্রাক, রেল, নৌকা, কুল ভ্যান, ট্রলি গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হয় অথবা পায়ে হেটে পরিবহন করা হয়।
- তবে সব থেকে কম খরচে যে পথে পরিবহন করা যায় সেই পথই পছন্দ করা হয়।
- নষ্ট এর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যত দ্রুত সম্ভব পরিবহন করতে হয়।
- স্বাস্থসম্মত উপায়ে পরিবহন করা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত পাত্র প্রতিবার পরিবহনের পরে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে প্রথমে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে পরে গরম পানিতে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ব্রাশ দিয়ে ধুতে হবে পরে আবার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে পরিশেষে গরম পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং সূযের তাপে শুকিয়ে নিতে হবে।

সেশন-১৬

দুধ প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ

(Milk Processing, Preservation and Marketing)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- দুধ প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি
- দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি
- দুধ বাজারজাতকরন প্রক্রিয়া

দুধ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ঃ

কাঁচা দুধের মান (Raw milk quality) ঃ

কাঁচা দুধ যেটা পাস্তুরাইজেশন, আল্ট্রা পেস্টুরাইজেশন বা অ্যাসেপটিক প্রসেসিং করা হবে তার বৈশিষ্ট্য ঃ

- ব্যাকটিরিয়ার পরিমানঃ ১০০,০০০ cfu/ml পৃথক খামারের দুধের জন্য এবং ৩০০,০০০ cfu/ml পাস্তুরিত করার পূর্বে একসাথে মিশানো
- দুধে সোমটিক সেলের পরিমানঃ ৭৫০,০০০/ml
- এন্টিবায়োটিক এর উপস্থিথি থাকবে না
- প্লান্টে স্টোরেজ টাইম হবে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টা

থার্মাইজেশন (Thermization) ঃ

- ৫৭-৬৮ডিগ্রি সে: এ ১৫ সেকেন্ড গরম করতে হয় যেন কাঁচা দুধে থাকা জীবাণু মারা যায়।
- এটা করতে হয় সেই কাঁচা দুধের জন্য যেটা কয়েক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয় পাস্তুরিত করার পূর্বে।

পরিস্কারকরন (Clearification) ঃ

- ছোট কনা, খড় এবং চুল দূর করার উপায় হচ্ছে পরিষ্কারকরণ।

ব্যাক্টিফিউগেশন (Bactifugation) ঃ জীবাণু দূর করার উপায় যেটা সেন্ট্রিফিউগেশন এর ম্যাধমে করা হয়।

- দুইধাপের সেন্ট্রিফিউগেশন জীবাণু ও তার স্পোরের লোড ৯৯% কমায়।
- এখানে আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে ৫৫-৬০ডিগ্রি সে.।
- এছাড়া মাইক্রোফিলট্রেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চর্বি প্রমিতকরন/ ডিক্রিমিং (Fat standardization/decreaming) ঃ

- দুধে ফ্যাট বা চর্বি বেশি থাকলে ক্রিম আলাদা করে তা সমন্বয় করতে হয়।
- এ কাজে সেন্ট্রিফিউগাল আলাদাকরন যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।
- দুধে ফ্যাট বা চর্বি কম থাকলে- ক্রিম যোগ করে অথবা ননী বিহীন দুধ আলাদা করে সমন্বয় করতে হয়।

সু-সমন্নয় করা (Homogenization) ঃ

- সু-সমন্নয় হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে দুধের চর্বির ক্ষুদ্র গোলাকার দানাগুলো ভেঙে ফেলা হয় যাতে দুধ ৪ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় রাখলেও দৃশ্যমান কোন চর্বি কনা না দেখা যায়।
- এটি একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেখানে দুধকে সরু পথ বা পাইপের মধ্যে দিয়ে উচ্চ বেগে পরিচালিত করা হয়।

পাস্তুরিতকরন (Pasteurization) ঃ

এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুধের প্রতিটি কনাকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফুটানো হয় যেন দুধের মধ্যে

অবস্থিত সমস্ত জীবাণু মারা যায় এবং এনজাইমগুলো অকার্যকর হয়ে যায়। আর ফুটানোর পর পরই ৫ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয় এবং খেয়াল রাখা হয় যেন নতুন করে দুধে জীবাণু সংক্রমণ না হয়।

পাস্তুরিতকরণের তাপমাত্রা ও সময় ঃ

- ৬৩ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট-এর উপরে ফুটানো (**LTLT**)
- ৭২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড-এর উপরে ফুটানো (**HTST**)
- ১৩৮ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ২ সেকেন্ড-এর উপরে ফুটানো (**UHT**)

পাস্তুরিতকরনের পরে গ্রেড এ দুধের রাসায়নিক, ব্যাকটিরিওলজিক্যাল এবং তাপমাত্রার মান ঃ

- ব্যাকটিরিয়ার পরিমান ঃ <২০,০০০ **cf/ml**
- কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমান ঃ < ১০/**ml**
- এন্টিবায়োটিক- এর উপস্থিথি থাকবে না
- সংরক্ষণ করতে হবে- ৭ ডিগ্রি সে. অথবা তার নিচে

আলট্রা পাস্তুরিতকরন (UHT) ঃ

- ১৩৮ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ২ সেকেন্ড।

ইউপি দুধ (UP Milk- Ultra Pasteurized Milk) আলট্রা পাস্তুরিতকৃত কিন্তু নির্বীজ পদ্ধতিতে প্যাকেট করা হয় না তাই ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হয়। ইউএইচটি দুধ (UHT Milk- Ultra High Temperature Pasteurized Milk) আলট্রা পাস্তুরিকৃত এবং নির্বীজ পদ্ধতিতে প্যাকেট করা তাই স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

আলট্রা পাস্তুরিতকরনের পরে গ্রেড এ দুধের রাসায়নিক, ব্যাকটিরিওলজিক্যাল এবং তাপমাত্রার মান ঃ

- কোন ব্যাকটিরিয়া উপস্থিত থাকবে না।
- এন্টিবায়োটিক- এর উপস্থিতি থাকবে না।
- সাধারন তাপমত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে।

দুধ প্যাকটেজাতকরনের উদ্দেশ্য ঃ

- কার্যকরভাবে দুধ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা।
- দুধের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা।
- সঠিক পুষ্টি এবং ঘ্রাণ যথাযথভাবে বজায় রাখা।
- নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাচায়।

দুধ প্যাকটেজাতকরন পদ্ধতি ঃ

- কাঁচের বোতলে।
- প্লাস্টিকের পাত্রে।
- প্লাস্টিক বাগে।
- কার্টুনে।
- টেট্রা প্যাকে।

দুধ বাজারজাতকরণ বা বিপনন ঃ

বিপণন কি?

বিপণন হচ্ছে উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য ও পরিষেবার প্রবাহের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের পারফরম্যান্স। প্রতিটি বিপণন শৃঙ্খলে নিজস্ব স্বার্থযুক্ত বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে।গ্রাহকরা যতটা সম্ভব কম দামে তাদের যা প্রয়োজন তা পেতে চান। অন্যদিকে উৎপাদকরা তাদের পণ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য রিটার্ন পেতে আগ্রহী। তাদের মধ্যে বাজারের মধ্যস্থতাকারী রয়েছেন, যারা বিভিন্ন বিপণনের কাজ যেমন পরিবহন বা খুচরা বিক্রয় করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

দুধ বিপণন চ্যানেল (Milk Marketing Channels) ঃ

দুধ বিপণন পদ্ধতির গবেষণা থেকে দেখা গেছে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কমপক্ষে ৮ টি বিভিন্ন বিপণন চ্যানেল রয়েছে:

Milk Marketing Channels	Number of Intermediaries
•Producer ▸ Consumer	0
•Producer ▸ Milk hawker ▸ Consumer	1
•Producer ▸ Processor ▸ Consumer	1
•Producer ▸ Processor ▸ Retailer ▸ Consumer	2
•Producer ▸ Dairy Cooperative ▸ Processor ▸ Retailer ▸ Consumer	3
•Producer ▸ Milk Transporter ▸ Processor ▸ Retailer ▸ Consumer	3
•Producer ▸ Milk trader ▸ Processor ▸ Retailer ▸ Consumer	3
•Producer ▸ Dairy coop ▸ Milk Transporter ▸ Processor ▸ Retailer ▸ Consumer	4

দুধ বিপণনে জড়িত মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা উৎপাদক এবং ভোক্তাদের কাছে দুধের দামে বিশেষ প্রভাব ফেলে। চ্যানেলটি যত সংক্ষিপ্ত হবে যে ভোক্তার নিকট দাম কম হওয়ার এবং উৎপাদক উচ্চতর রিটার্ন পাবার তত বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, বিপণনের চেইনটি সংক্ষিপ্ত, খুচরা দাম কম এবং সাশ্রয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

দুধ ও দুধজাত পণ্যের বিপণন মূল্য নির্ধারণ ঃ

বাজারে একটি পণ্যের দাম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভোক্তাদের চাহিদাকে প্রভাবিত করে । তাই দুগ্ধজাত পণ্য অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক দামের হতে হবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, বিপণন ও বিতরণে জড়িত ব্যয়গুলি যতটা সম্ভব কম রাখা উচিত। সাধারণত দুগ্ধজাত পণ্যের দামের সাথে নিম্নলিখিত ব্যয় জড়িত থাকে:

ক। কাঁচা দুধের দাম
খ। কাঁচা দুধ সংগ্রহ এবং পরিবহন খরচ
গ। প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যয়
ঘ। প্যাকেজিংয়ের ব্যয়
ঙ। বিপণন ও বিতরণ খরচ
চ। কর এবং শুল্ক

বিপণন চ্যানেলের প্রতিটি পর্যায়ে লাভের মার্জিন (সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মার্জিন) প্রতিটি পর্যায়ে জড়িত সমস্ত উপাদানগুলি অবশ্যই এক ইউনিটের ভিত্তিতে গণনা করতে হবে। এটি ব্যয় হিসাব হিসাবে পরিচিত। নীচের সারণীতে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপাদান দেখানো হয়েছে:

Market function	Cost element
Raw milk procurement	Cost of raw milk; labour; materials etc.; collection margin
Transportation	Transport cost; labour; materials and equipment; transport margin
Processing	Raw materials; machinery and equipment; labour; packaging; energy; taxes; marketing and distribution; processing margin
Marketing and distribution	Transport; labour; materials; rent; retail margin

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ও উন্নয়ন ঃ

ভ্যালু (Value) ঃ সাধারন অর্থে ভ্যালু হচ্ছে মূল্য কিন্ত বিপণন অর্থে ভ্যালু হচ্ছে পণ্য বা সেবার গুণগতমান (Qualitz), অনন্যতা (Exclusivitz), নিভরযোগ্যতা (Reliabilitz), সুবিধা (Convenience) ইত্যাদি। ভ্যালু মূল্যায়ণ করা হয় পণ্যের কার্য ক্ষমতা, সরবরাহের গতি, বিক্রয় পরবর্তী সেবা এবং ব্যয়। একটি পণ্য বা সেবা থেকে ক্রেতার প্রত্যাশা এবং সেই পণ্য বা সেবার জন্য ক্রেতার ব্যয় এ দুয়ের পার্থক্য হল ভ্যালু (Value).

ভ্যালু চেইন (Value Chain) ঃ কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্য/সেবা পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখন ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে।

মূল্য সংযোজন (Value Addition) ঃ
বাছাইকরণ (Sorting), গ্রেডিং, মোড়কীকরণ (Packaging) এবং হিমাগারে সংরক্ষন ইত্যাদির ফলে পণ্যের উপর ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে। যদি ভ্যালু সংযোজিত না করা হয় তবে তাকে সাপ্লাই চেইন বলা হবে।

ডেইরি ভ্যালু চেইন (Dairy Value Chain) ঃ দুধ উৎপাদন বা সংগ্রহ থেকে শুরু করে পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, গ্রেডিং, মোড়কীকরণ, হিমাগারে সংরক্ষণ, খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সরবরাহ এবং ভোক্তার নিকট বিক্রি প্রভৃতি পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যে মূল্য সংযোজন হয়ে থাকে। উৎপাদক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়াকে ডেইরি ভ্যালু চেইন বলে।
দুধ হতে সাধারনত: যেসব দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি করা হয়ে থাকে সেগুলিকে ব্যালু এডেড পণ্য বলে। যেমন-দই, ছানা, মিষ্টি, ঘি, মাঠা, মাখন, পনির ইত্যাদি ঃ

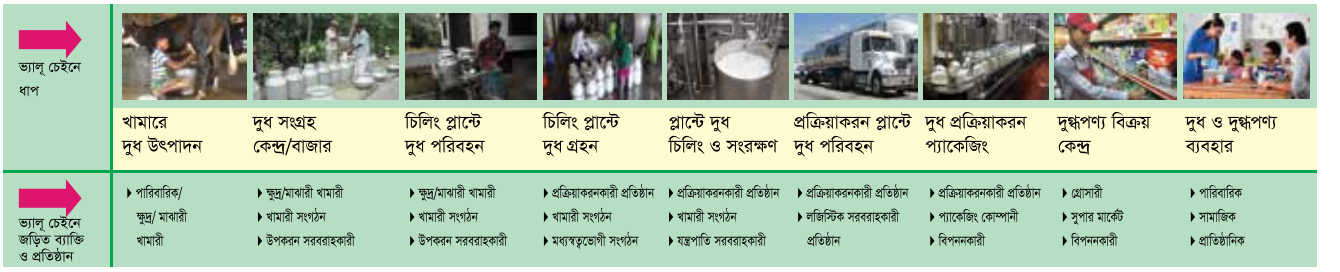

ডেইরি ভ্যালু চেইন ঃ (চিত্র-১)

ভ্যালু এডেড ডেইরি পণ্য ঃ (চিত্র-২)

সেশন-১৭

ডেইরি প্রাণির প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

(Reproductive Health Management of Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গাভীর প্রজনন অঙ্গের সংক্রামক রোগব্যাধি
- গাভীর ম্যাস্টাইটিস রোগ ও তার প্রতিকার
- ম্যাস্টাইটিস সনাক্তকরণ কৌশল
- ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যাস্টাইটিস টেস্ট (সিএমটি)
- গাভীর মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, ভ্যাজাইনাইটিস রোগ ও তার প্রতিকার

খামারে গবাদিপশুর প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধের জন্য রুটিন স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। সাধারণভাবে খামারে দুগ্ধপশুর পালে যে কোনও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করা জরুরী।
জনন অঙ্গ হচ্ছে পশুর বংশবৃদ্ধির অঙ্গ। এ অঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধির কারণে এদের বংশধর উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। জনন অঙ্গে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। জনন অঙ্গের রোগগুলো জীবাণু, পরজীবী, পুষ্টিহীনতা, আঘাত, হরমোনের গোলোযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

গাভীর জনন অঙ্গের সংক্রামক রোগব্যাধি ঃ

গাভী/বকনার জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের মধ্যে ম্যাস্টাইটিস, মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস, ব্রুসেলোসিস, লিস্টেরিওসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস উল্লেখযোগ্য।

ক) গাভীর ওলান প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস রোগ ও তার প্রতিকার ঃ

ব্যাকটিরিয়া বা মাইকোটিক প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রমণের প্রভাবের কারণে প্রায়শই ওলান গ্রন্থির প্রদাহ সৃষ্টি হয়। খামারের অপরিচ্ছন্ন বাসস্থান, দুধ দোহনকারীর অপরিষ্কার হাতের মাধ্যমে এই রোগের জীবানু ওলানের বাঁটের ভিতর প্রবেশ করে এই রোগের সৃষ্টি করে। এ ছাড়া ওলানে দুধ জমে থাকলেও এ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

ম্যাস্টাইটিসের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রদাহ টিস্যুর ক্ষতি করে। প্রদাহের সময় মৃত টিস্যু এবং বিষাক্ত পদার্থগুলি প্রাণির শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রক্তনালীগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে আরও রক্ত প্রবাহ ঘটে, যার ফলে আরও লাল রঙ হয় এবং আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠে। এটি তরল এবং রক্ত জমা হওয়ার কারণে একটি বেদনাদায়ক ফোলাভাব ঘটায়।

ম্যাস্টাইটিস সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলি দুগ্ধ খামারে মাটিতে, গোবরে, গবাদিপশুদের ত্বকে এবং দুধের পাত্র, দুধ দোহন বা ব্যবহারকারী হাতে প্রভৃতি জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারে। খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও জীবানু সংক্রমন ঘটতে পারে। নোংরা, উষ্ণ এবং ভেজা পরিবেশগুলি এই জীবাণুগুলির বেঁচে থাকার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

ফ্যাক্টরগুলি যা ম্যাস্টাইটিস প্রতিরোধ করে ঃ

খামারের দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ম্যাস্টাইটিসের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে । আশেপাশে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি যত বেশী সংক্রমণের সম্ভাবনাও তত বেশি। ম্যাসাটাইটিস বিকাশের অন্যান্য কারণ রয়েছে:

উচ্চ দুধ উৎপাদনকারী গাভীগুলি আরও সহজে ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্ত হয়। গাভীর উচ্চ দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া অধিক শক্তির চাহিদার সাথে সংযুক্ত থাকে যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

দুধ দোহনের দুর্বল কৌশল: ফোর্স মিল্কিং টিট এবং টিট নালার ক্ষতি করতে পারে যা ওলানে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশকে সহজ করে তোলে। অসম্পূর্ণ দুধদোহন ব্যাকটিরিয়া সংক্রমনের আরেকটি কারণ।

অস্বাস্থ্যকর দুধদোহন পদ্ধতি: অপরিষ্কার দোহন পাত্র, অপরিষ্কার হাতে দুধ দোহন, অপরিষ্কার গাভীর দেহ ও ওলান।

অস্বাস্থ্যকর আবাসন ব্যবস্থা: দুধ দোহনের পরে ২০ মিনিট সময় লাগে বাঁটের নালাগুলি পুরোপুরি বন্ধ হতে। অপরিষ্কার মেঝের জীবানু সহজে এসময় বাঁটে প্রবেশ করতে পারে। পরিষ্কার মেঝে এবং বিশ্রামের জায়গার অভাবে ওলানে ম্যাস্টাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

বাঁটের ক্ষত এবং বাঁটে ঘা: এটি বিভিন্ন কারণের কারণে হতে পারে যা ওলানে ম্যাস্টাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়ায়।

পরিবেশগত রোগজীবাণুগুলির সংস্পর্শ: প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া উপস্থিতি আছে এমন পরিবেশে গাভীর বাঁটের মধ্যেজীবানু সহজেই প্রবেশ করে এবং মাস্টাইটিস সৃষ্টি করে।

মাস্টাইটিসের ক্লিনিকাল লক্ষণ ঃ

সংক্রমণের তীব্রতা বিভিন্ন পর্যায়ের উপর নির্ভর করে ।

ম্যাসাটাইটিসের বাহ্যিক লক্ষণ- ওলান ও বাট লাল হয়ে উঠে। ওলান ফুলে ওঠে। ওলানে ব্যাথা অনুভূত হয়। ওলান শক্ত ও গরম হয়ে উঠে। হাঁটতে কষ্ট হয়। বাঁট টানলে কখনও অতি পাতলা দুধ বের হয় অথবা সাদা রস অথবা ছানার মত জমাট বাঁধা দুধ আসে।

অতি তীব্র মাস্টাইটিস (Per acute mastitis) ঃ ওলান গ্রন্থিটিতে ফোলাভাব, তাপ, ব্যথা এবং অস্বাভাবিক নিঃসরণ হয়। এছাড়া জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষুধা হ্রাসের মতো লক্ষণ দেখা দেয়।

তীব্র মাস্টাইটিস **(Acute/sub acute mastitis) ঃ** লক্ষণগুলি অতি তীব্র ম্যাসাটাইটিসের মত তবে জ্বর, ক্ষুধা হ্রাস, হতাশা, এবং গ্রন্থির পরিবর্তনগুলি কিছুটা কম হয়।

সাবক্লিনিকাল মাস্টাইটিস **(Subclinical mastitis) ঃ** প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্তযোগ্য, দুধ দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হবে না, তবে দুধের স্বাদ নোনতা হয়ে যাবে।

মাস্টাইটিসের প্রথম লক্ষণ দুধের পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেমন দুধে ফ্লেক্স এবং পিণ্ড হতে পারে, দুধের রঙ পরিবর্তন হতে পারে, দুধ পানিযুক্ত হতে পারে, হলুদ বা নীল বর্ণের পরিবর্তে দুধ গোলাপী রঙ ধারণ করে।

ম্যাসাটাইটিস সনাক্তকরণ কৌশল ঃ

স্ট্রিপ কাপ কৌশল-

স্ট্রিপ কাপ-এ একটি কালো এনামেল প্লেট এবং একটি কাপ আছে। গাভী ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা হয়। দোহনের শুরুতেই প্রতিটি বাট থেকে এক থেকে দুই ফোঁটা দুধ স্ট্রিপ কাপে নেয়া হয়। এতে করে দুধে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তা দোহনকারী বুঝতে পারে এবং পাশাপাশি বাঁটে কোনো ময়লা থাকলে তা বের হয়ে আসে।

Fig: checking the milk on clinical signs of mastitis

ক্যালিফোর্নিয়া মাস্টাইটিস টেস্ট (সিএমটি)-

সিএমটি সাবক্লিনিকাল ম্যাসাটাইটিসের জন্য ওলানের অবস্থা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি দুধে মৃত কোষের পরিমাণ পরিমাপ করে। ওলানের টিস্যুতে প্রাকৃতিকভাবে ক্রমাগত নবায়ন প্রক্রিয়ার কারণে দুধে সর্বদা মৃত কোষ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত কোষের পরিমাণ কম এবং প্রতি মিলিলিটার দুধে কোষের সংখ্যা প্রায় ১০০,০০০ থাকে যা সিএমটি সনাক্ত করে না। যখন একটি ওলানে সাবক্লিনিকাল ম্যাসাটাইটিসের সংক্রমণ হয়, তখন প্রতি মিলিলিটার দুধে কোষের সংখ্যা ২৫০,০০০ এরও বেশি বৃদ্ধি পায় এবং সিএমটি দিয়ে পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করা যায়।

Procedure of CMT:

১. প্রথমে গাভীর ওলানের চারটি অংশ থেকে দুধের প্রথম তিনটি টান দুধ ফেলে দিতে হবে।

২. ওলানের প্রতি অংশ বা কোয়ার্টার থেকে কয়েক মিলিলিটার দুধ বিভিন্ন সিএমটি র‍্যাক কোয়ার্টারে নিতে হবে (পেট্রিডিশগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে) এবং এর সাথে সম্পর্কিত কোয়ার্টারগুলি চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

৩. প্রতিটি র‍্যাক কোয়ার্টারে দুধের নমুনা (টি-পোল এবং প্রায়শই সাধারণ ডিশ ওয়াশ ডিটারজেন্টও উপযুক্ত হবে) এর সাথে সমান পরিমাণ সিএমটি রিএজেন্ট মিশ্রিত করতে হবে।

৪. এরপর আলতো করে প্রতিটি মিশ্রণ নাড়াচাড়া করতে হবে এবং নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে:

- দুধে ম্যাসটাইটিস জীবানু আক্রান্ত হলে এটি একত্রিত হয়ে জেল বা আঠালো হয়ে উঠবে।
- দুধের সান্দ্রতা (Viscosity) বেশি হওয়া মানে অধিক মৃত কোষের উপস্থিতি যা মারাত্মক সাবক্লিনিকাল সংক্রমণ নির্দেশ করে।
- দুধে বেগুনি থেকে গোলাপি রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।
- দুধ ঘন হয়ে যাবে।

Figure 7: The California Mastitis Test

জরায়ু প্রদাহ (Metraitis) ঃ

স্ত্রী পশুর জরায়ু বা ইউটেরাসের (Uterus) প্রদাহকে জরায়ুপ্রদাহ বলে। পশুর জরায়ুর দেয়ালের তিনটি স্তরই এতে আক্রান্ত হতে পারে। আর স্তর আক্রান্তের ওপর ভিত্তি করে তাই এগুলো যথাক্রমে এন্ডোমেট্রাইটিস, মায়োমেট্রাইটিস ও পেরিমেট্রাইটিস এ তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

কারণ ঃ

- ✓ সাধারণত বাচ্চা প্রসবের পরে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণে পশুতে তীব্র প্রকৃতির জরায়ু প্রদাহের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও প্রোটোজোয়ার কারণে স্ত্রী পশুর জরায়ুপ্রদাহ হয়।
- ✓ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যেমন– *Corynebacterium pyogenes*, *Brucella abortus*, *Campylobacter foetus*; ছত্রাক, যেমন– *Aspergillus spp. Abside spp.* ইত্যাদি; ভাইরাস; প্রোটোজোয়া যেমন– *Trichomonas foetus* প্রভৃতি গাভী ও মহিষ গাভীতে এ রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- ✓ ছাগী ও ভেড়ীতে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া (যেমন– *Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella ovis, Campylobacter foetus, Samonella typhimurium, Listeria monocytogenes* ইত্যাদি), ভাইরাস, প্রোটোজোয়া (যেমন– *Toxoplasma gondii*) প্রভৃতির সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগ সংক্রমণ ঃ

- ✓ প্রসবের পর বা যে কোনো সময় যোনিপথের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।
- ✓ প্রসব বিঘ্নের পরীক্ষায় পরীক্ষাকারীর অপরিষ্কার হাতের মাধ্যমে।
- ✓ রোগাক্রান্ত ষাঁড়ের সঙ্গে যৌন মিলনের সময়।
- ✓ জরায়ুতে থেকে যাওয়া গর্ভফুলের পচনের ফলে।
- ✓ গর্ভ ও প্রসবকালীন কোনো দুর্ঘটনা বা রোগের ফলে।

জরায়ুপ্রদাহ তীব্র বা রোগ লক্ষণ ঃ

জরায়ু প্রদাহ তীব্র বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির হতে পারে। তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে

- ✓ জরায়ুতে পুঁজ হয়। দুর্গন্ধময় পুঁজমিশ্রিত লাল বা ধূসর বর্ণের স্রাব যোনিমুখ দিয়ে নির্গত হয়।
- ✓ ক্ষুধামন্দা, জ্বর, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয়।
- ✓ যোনিতে পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা পরিলক্ষিত হয়।
- ✓ পশু ব্যথায় পিট বাঁকা করে রাখে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির ক্ষেত্রে ঃ

- ✓ উপরের সবগুলো লক্ষণই মৃদু আকারে দেখা যায়।
- ✓ পশু বাচ্চা দেয় না।
- ✓ গর্ভপাত হতে পারে।
- ✓ অনেক সময় প্রসবোত্তর দুধদান হ্রাস পায়।

রোগ নির্ণয় ঃ

- ✓ পশুর প্রজনন ও রোগের ইতিহাস থেকে
- ✓ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ দেখে।
- ✓ রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে।
- ✓ গবেষণাগারে জরায়ুর স্রাব স্টেইন ও কালচার করে জীবাণু সনাক্তের মাধ্যমে।

চিকিৎসা ঃ

সঠিক চিকিৎসার জন্য নিম্নে যে কোনো একটি জীবানুনাশক ওষুধ দিয়ে পশুর জরায়ু ধৌত করা যায়।

- ♦ প্রতিদিন বা একদিন পরপর ২০–১৫০ মি.লি. হিসেবে মোট ৫-৭ দিন পশুর জরায়ু লুগল'স আয়োডিন দিয়ে ধৌত করা।
- ♦ লুগল'স আয়োডিন দিয়ে জরায়ু ধৌত করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোস্টাগ্যান্ডিন এফ২ আলফা ব্যবহার করা যায়।
- ♦ পেসারিজ বা অন্যান্য ওষুধ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ মতো ব্যবহার করা যায়।
- ♦ জীবাণু সংক্রমণের জন্য জ্বর হলে ডাক্তারের নির্দেশমতো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

পুঁজ জরায়ু (Pyometra) ঃ

পশুর জরায়ুতে পুঁজ জমা হওয়াকে পুঁজ জরায়ু বা পায়োমেট্রা বলে। প্রায় সকল গবাদি পশু এতে আক্রান্ত হয়।

কারণ ঃ

- ✓ প্রধানত বিভিন্ন ধরনের পুঁজ সৃষ্টিকারী জীবাণু সংক্রমণের কারণে এ রোগ হয়।
- ✓ ট্রাইট্রাইকোমোনাস নামক পরজীবী আক্রান্ত গাভীতেও পুঁজজরায়ু দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ ঃ

- ✓ পুঁজ জরায়ু রোগে পশুর জরায়ু থেকে পুঁজযুক্ত স্রাব বের হয় । জরায়ু থেকে হলুদ বর্ণের পুঁজযুক্ত স্রাব নির্গত হয়।
- ✓ পশু গরম হয় না।
- ✓ জরায়ুর মুখ অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুঁজ বের হতে না পারার কারণে পেট ফুলে যায়।
- ✓ হলুদ বা লালচে বর্ণের স্রাব বের হয়।
- ✓ রোগের শেষ পর্যায়ে টক্সিমিয়া হয়ে পশু মারা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ

- ✓ রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ✓ রেকটাল পালপেশনের মাধ্যমে ডিম্বাশয় পরীক্ষা করলে তাতে করপাস লুটিয়ামের উপস্থিতি বুঝা যায়।

চিকিৎসা ঃ
প্রোস্টাগ্যান্ডিন, অক্সিটোসিন ও জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে পায়োমেট্রার চিকিৎসা করা হয়।

- ✓ প্রোস্টাগ্যান্ডিন এফ২ আলফা নির্ধারিত মাত্রায় (৫ মি.লি.) গাভীর মাংসপেশিতে ইনজেকশন করতে হবে।
- ✓ পুঁজ বের করার জন্য ৪ মি.লি. মাত্রায় সিনথেটিক অক্সিটোসিন গাভীর মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে।
- ✓ জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন অ্যাক্রিফ্লাভিন) দিয়ে জরায়ু পরিষ্কার করে সেখানে যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে ।
- ✓ জ্বর থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

জরায়ুগ্রীবা প্রদাহ (Cervicitis) ঃ প্রসব বিঘ্ন, গর্ভপাত, গর্ভফুল নির্গমনে ব্যাঘাত, কৃত্রিম প্রজনন বা জরায়ু পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত টিউব ইত্যাদির কারণে জরায়ু গ্রীবা বা সার্ভিক্সে প্রদাহ হয়। এ রোগ চিকিৎসায় ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ মতো পেসারি ও অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনে সুফল পাওয়া যায়।

ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস (Vulvo-vaginitis) ঃ
যোনি (Vagina) ও যোনিমুখের (Vulva) প্রদাহকে ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বলে।

কারণ ঃ
নিম্নলিখিত রোগের কারণে বিভিন্ন পশুতে ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস সংক্রমিত হয়। যথা–

- ✓ ঘোড়ার কয়টাল একজেনথেমা বা ভেসিকুলার ভেনেরাল ডিজিজ।

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ ঃ

- ✓ গাভীর ইনফেকশাস পাসচুলার ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বা গ্র্যানুলার ভালবোভ্যাজাইনাইটিস বা ভেনেরাল ডিজিজ।
- ✓ গাভীর আলসারেটিভ ডার্মাটাইটিস।
- ✓ এছাড়াও আঘাত, গর্ভফুল আটকে যাওয়া, যোনির বহির্গমন ইত্যাদি।

লক্ষণ ঃ

- ✓ ঘোড়ার কয়টাল একজেনথেমা রোগে যোনি ও যোনিমুখে প্রথমে ছোট ছোট ফোস্কা পড়ে, পরে সেখানে পুঁজ জমে ও শেষে ক্ষত বা ঘায়ের সৃষ্টি হয়।
- ✓ গাভীর গ্র্যানুলার ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস রোগে যোনি ও যোনিমুখে নডিউল সৃষ্টি হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ
চাক্ষুষ ও ভ্যাজাইনাল স্পেকুলামের সাহায্যে পরীক্ষা করে ভালভো-ভ্যাজাইনাইটিস রোগ নির্ণয় করা হয়।

- ✓ দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে যোনিমুখের দুঠোঁট ফাক করে সরাসরি চাক্ষুষ পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ✓ এছাড়াও ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম নামক যন্ত্রের সাহায্যে যোনি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ
যেসব রোগের কারণে এ রোগ সৃষ্টি হয় সেসব রোগের চিকিৎসা করলে এ রোগ সেরে যায়।

সেশন-১৮

ডেইরি প্রাণির জুনোটিক রোগ ব্যাধি ব্যবস্থাপনা

(Zoonotc Disease Management in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ডেইরি প্রাণির জুনোটিক রোগব্যাধি ও তার কারন
- জুনোটিক রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার
- জনস্বাস্থ্যের উপর জুনোটিক রোগব্যাধির প্রভাব

গবাদিপশুর জুনোটিক রোগ ব্যাধি ঃ

যে রোগগুলি প্রাকৃতিকভাবে প্রাণি এবং মানুষে এবং মানুষ থেকে প্রাণিতে সংক্রামিত হয় তাকে জুনোটিক রোগ বলে। জুনোটিক রোগগুলি জনস্বাস্থ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। লোকবলের দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি, অপুষ্টি, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, প্রাণিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ইত্যাদি জুনোটিক রোগের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

গবাদিপশু হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরূপ কয়েকটি রোগ ঃ

ব্যাকটেরিয়াজনিত	ভাইরাসজনিত	পরজীবিজনিত
তড়কা (Anthrax)	জলাতংক (Rabies)	টিনিয়াসিস (Taniasis)
যক্ষা (Tuberculosis)	ম্যাড কাউ (Mad cow)	মেঞ্জ (Mange)
ধনুষ্টংকার (Teyanus)	সার্স (SARS)	ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Tricomoniasis)
ব্রুসেলোসিস (Brucellosis)	মানকি পক্স (Monkey pox)	টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasma gondi)
ভিব্রিওসিস (Vibrisis)	প্যারাপক্স (Para pox)	হুক ওয়ার্ম (Aneylostoma aninum)

*সম্প্রতি বাংলাদেশের গবাদিপশুতে Parapoxvirus নামক জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে (Lederman et al. 2014)।

গবাদিপশু থেকে সংক্রমণ হওয়ার জন্য প্রায় ৪৫ টি জুনোটিক রোগ রয়েছে। দুগ্ধ খামারিরা যারা তাদের পশুর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে তারা সর্বদা প্রাণি থেকে সংক্রমণ গ্রহণের ঝুঁকি নিয়ে থাকে, বিশেষত যেহেতু আমাদের দেশে এই রোগগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কৃষক এই রোগগুলি সম্পর্কে সচেতন হন যা তাকে ডাক্তারের কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ বা চিকিৎসা নিতে সহায়তা করতে পারে। এই বিভাগটি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত জুনোটিক রোগগুলি বর্ণনা করে যা গবাদিপশু দ্বারা সংক্রমণ হতে পারে।

জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট খামারে গবাদিপশুর প্রধান রোগ ব্যাধির মধ্যে ব্রুসেলোসিস, লিস্টেরিওসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, এ্যানথ্রাক্স, বোভাইন টিউবারকিউলোসিস, লেপটোস্পাইরোসিস, রেবিস অন্যতম।

ডেইরি প্রাণির জুনোটিক রোগের কারন, লক্ষণ, প্রতিকার ও জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

১) ব্রুসেলোসিস (Brucellosis):

গবাদিপশুর প্রজনন ব্যহতকারী সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্রুসেলোসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে গর্ভপাত এবং পরবর্তীতে প্রজনন অক্ষমতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কারণ ঃ Brucella *(ব্রুসেলা)* গণভুক্ত কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া মানুষ ও গবাদিপশুতে ব্রুসেলোসিস রোগ সৃষ্টি করে। যেমন– Brucella abortus *(ব্রুসেলা অ্যাবোরটাস)*

রোগের প্রধান লক্ষণ ঃ সাধারণত গর্ভকালের ৫-৭ মাসের মাথায় গর্ভপাত হয়। জীবাণু আক্রমণের ফলে জরায়ুর অন্তরাবরণিকার প্রদাহ দেখা দেয়। ফলে গর্ভপাতের পর জরায়ু সংকোচনে বিলম্ব ঘটে গর্ভফুল আটকে যায়। পুঁজযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। গর্ভপাতের পর অধিকাংশ গাভী বহুদিন পর্যন্ত অনুর্বর থাকে।

রোগ নির্ণয় ঃ গর্ভাবস্থার ৫-৭ মাসের পর গর্ভপাতের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ থেকে প্রাথমিকভাবে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা ঃ সালফাডায়াজিন ও অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক এ জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। তাই ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ মতে এগুলো দিয়ে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। তবে এ রোগ খামারের অন্য পশুতে সংক্রমন ঘটাতে পারে বিধায় খামারে না রাখাই শ্রেয়।

প্রতিরোধ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য, বিশেষত Brucella abortus এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া যায়। তবে, বাংলাদেশে এ টিকা প্রস্তুত হয় না।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

এটি একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়। বেশির ভাগ সাধারণ লক্ষণগুলি হল জ্বর, জয়েন্টে ব্যথা এবং ফোলাভাব, ঘাম, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, বুকে এবং পেটে ব্যথা ইত্যাদি।

সংক্রামিত প্রাণির কাঁচা দুধ পান করে বা ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লি, বিশেষত কনজেক্টিভা দ্বারা সংক্রামিত ক্ষরণের সংস্পর্শে এসে মানুষ এ রোগে সংক্রামিত হয়।

২) লিস্টেরিওসিস (Listeriosis) ঃ

লিস্টেরিওসিস মানুষসহ অন্যান্য প্রায় সব পশুপাখির একটি সংক্রামক রোগ। রক্তদুষ্টি, গর্ভপাত ও মেনিনজো-এনসেফালাইটিস এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কারণ ঃ Listeria monocytogenes *(লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনিস)* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার ৫টি সিরোটাইপ মানুষসহ ৩৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৭ প্রজাতির পাখি ও মাছকে আক্রান্ত করে। প্রায় সব বয়সের পশুপাখি এতে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ ঃ

সেপ্টিসেমিয়া প্রকৃতি ঃ সাধারণত সরল পাকস্থলীবিশিষ্ট ও বাচ্চা রোমন্থক পশুতে এ প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ প্রকৃতিতে– অবসাদ, দুর্বলতা, জ্বর ও ডায়রিয়া দেখা দেয়। স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। সবশেষে অক্ষিগোলক ও মস্তিষ্কের ঝিলির প্রদাহে ১২ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত পশু মারা যায়।

ভিসেরাল প্রকৃতি ঃ এ প্রকৃতিতে– গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে সংক্রমণ হলে গর্ভপাত হয়। গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে সংক্রমণ হলে মৃত বাচ্চা প্রসব করে। গর্ভপাতের পর গর্ভফুল আটকে যায়।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

লিস্টোরিওসিস সেপসিস, মেনিনজাইটিস, বা এনসেফালাইটিস সহ গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে, কখনও কখনও আজীবন ক্ষতি এবং এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ, ভ্রূণ, নবজাতক এবং যারা ইমিউনোকম্প্রোমাইজড। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এটি স্থির জন্ম(Still Birth) বা স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত হতে পারে এবং অকাল প্রসবের সাধারণ ঘটনা ঘটে।

৩) ভিব্রিওসিস (Vibriosis): ভিব্রিওসিস রোগের অপর নাম ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস (Campylobacteriosis) এ রোগে মানুষসহ বিভিন্ন পশু আক্রান্ত হয়।

কারণ ঃ Campylobacter foetus *(ক্যাম্পাইলোব্যাকটার ফিটাস)* নামক ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি ভ্যারাইটি ও উপপ্রজাতি গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ ও শুকরে এ রোগ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ ঃ গর্ভপাত ও প্রজনন অক্ষমতা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় ডায়রিয়া এবং ডিসেন্ট্রি বা আমাশয় দেখা যায়।

পানিশূন্যতা হতে পারে। রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা ঃ জেন্টামাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে এ রোগ চিকিৎসা করা যায়। পানিশূন্যতা সারাতে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ইনজেকশন করা যায়।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

যখন ভিব্রিও ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন পানির মত ডায়রিয়ার কারণ হতে পারে, এর সাথে প্রায়শই পেটে ক্র্যাম্পিং, বমি বমি ভাব, জ্বর এবং ঠান্ডা থাকে। সাধারণত এই লক্ষণগুলি জীবানু প্রবেশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং প্রায় ৩ দিনের মধ্যে থাকে। গুরুতর অসুস্থতা বিরল এবং সাধারণত দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

৪) ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis) ঃ

ট্রাইকোমোনাস প্রজাতির প্রোটোজোয়ার সংক্রমণে গাভীতে বোভাইন ট্রাইকোমোনিয়া রোগ হয়। এ রোগকে ট্রাইট্রাইকোমোনিয়াসিসও বলে।

কারণ ঃ Trichomonas foetus নামক প্রোটোজোয়ার সংক্রমণে পশুতে ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগে পাল দেয়ার ১ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে গাভীর গর্ভপাত হয়। গর্ভপাতকৃত ভ্রূণ এত ছোট থাকে যে তা পালনকারীর নজর এড়িয়েও যেতে পারে। গাভী অনিয়মিতভাবে গরম হয়, কিন্তু পাল রাখে না। যোনি ও জরায়ুপ্রদাহের ফলে স্রাব নির্গত হয়। গর্ভপাতের পর গর্ভফুল না পড়লে পুঁজযুক্ত এন্ডোমেট্রাইটিস হতে পারে। জরায়ুগ্রীবা বন্ধ থাকলে পায়োমেট্রা হতে পারে। গর্ভপাত না হলে অনেক সময় বিশুষ্ক বা মামিফাইড ফিটাসে (Mummified Foetus) রূপান্তরিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে, সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রোটোজোয়া শণাক্ত ও পৃথক করতে হবে।

চিকিৎসা ঃ সাধারণত গর্ভপাতের পর গাভী পূনঃগরম হলে পরপর তিনবার প্রজনন না করালে এমনিতেই ভালো হয়ে উঠে। তবে, গাভীর যোনিপথ জীবাণুনাশক পদার্থ, যেমন– অ্যাক্রিফ্লাভিন দ্বারা ৫ থেকে ৬ দিন ফ্লাশ করলে ভালো হয়। জরায়ুতে পুঁজ হলে তা জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ফ্লাশ করে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতে জরায়ুতে কোনো একটি ওষুধ প্রবেশ করাতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ

গর্ভপাতকৃত গাভী তিন মাসের মধ্যে গরম হলেও তাকে পাল না দিয়ে বিশ্রামে রাখত হবে। পাল দেয়ার পূর্বে গাভীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করাতে হবে এবং কৃত্রিমভাবে প্রজনন করাতে হবে। আক্রান্ত ষাঁড়কে জবাই বা খোঁজা করে ফেলতে হবে।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

ট্রাইকোমোনিয়াসিস আক্রান্ত মহিলাদের জন্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

প্রায়শই দুর্গন্ধযুক্ত গন্ধযুক্ত যোনি স্রাব - যা সাদা, ধূসর, হলুদ বা সবুজ হতে পারে। যৌনাঙ্গে লালভাব, জ্বলন এবং চুলকানি। প্রস্রাব বা যৌন মিলনের সাথে ব্যথা।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস খুব কমই পুরুষদের মধ্যে লক্ষণ সৃষ্টি করে। সাধারন লক্ষণগুলির মধ্যে-

লিঙ্গের ভিতরে জ্বালা। প্রস্রাবের সাথে বা বীর্যপাতের পরে জ্বালা, লিঙ্গ থেকে স্রাব নির্গত হওয়া।

৫) অ্যানথ্রাক্স ঃ

অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগ গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ। সেপ্টিসেমিয়া ও হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মানুষসহ যে কোনো ধরনের পশু আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে থাকে। নাক, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো বর্ণের (আলকাতরার মতো) রক্ত বের হতে থাকে। মৃত দেহে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মর্টিস (Rigor Mortis) হয় না। এটি এ রোগের জন্য রোগ লক্ষণিক ক্ষত বা প্যাথোগনোমনিক লেশন (Pathognomonic Lesion) ময়না তদন্তে প্লীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম এবং কয়লার মতো দেখায়।

রোগের কারণ ঃ

Bacillus anthracis (ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস) নামক এক ধরনের গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া তড়কা রোগের জন্য দায়ী। এ ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবরণী বা ক্যাপসুল আছে। ক্যাপসুল ও জীবাণুর মধ্যে একটি স্পোর থাকে। এ স্পোর জীবাণুনাশক ওষুধ

বা সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না। স্পোর মাটিতে ৩০–৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এ সময়ের মধ্যে কোনো পশু সেখানে চলাচল করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার ঃ
বিশ্বের প্রায় সব দেশে মানুষ সহ পশুর এ রোগ হয়। তবে, কুকুর, বিড়াল ও আলজেরিয়ান জাতের ভেড়াতে এ রোগ হয় না। এদেশে যে কোনো রোগে মৃত পশুকে খোলা অবস্থায় ভাগাড়ে ফেলে রাখা হয়। ফলে শবাহারি পশুপাখির মাধ্যমে রোগের জীবাণু ছড়ায় এবং মাটিতে স্পোর বিস্তার লাভ করে। এমতাবস্থায় খরার পর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে এবং গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এ জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এছাড়া বন্যার পানির মাধ্যমেও এ জীবাণু ছড়াতে পারে।

রোগ সংক্রমণ ঃ
নিম্নলিখিত ভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যথা–প্রধানত দুষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও স্পোর সংক্রমিত হতে পারে। ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়। Bacillus anthracis জীবাণু সেপ্টিসেমিয়া ও ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে।

রোগের বিকাশ ঃ
Bacillus anthracis জীবাণুর স্পোর দেহে সংক্রমিত হওয়ার পর শৈষ্মিক ঝিলী দিয়ে প্রবেশ করে এবং ফ্যাগোসাইটের (Phagocyte) মাধ্যমে স্থানিক লসিকা গ্রন্থিতে এসে বংশ বিস্তার করে। পরবর্তীতে এরা লসিকা গ্রন্থি থেকে রক্তে পৌঁছে রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়ার সৃষ্টি করে এবং দেহের প্রায় সকল টিস্যুকে আক্রান্ত করে। জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে। প্রধানত শক (Shock), তীব্র রেন্যাল অকার্যকারিতা ও কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্তের মধ্যস্থতায় অন্তিম অক্সিজেন স্বল্পতায় পশুর মৃত্যু ঘটে।

রোগের লক্ষণ ঃ
রোমন্থক পশুতে এ রোগ প্রধানত দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা–

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু কোনো লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যায়। তবে ১–২ ঘন্টা বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–জ্বর, পেশির কম্পন, শ্বাসকষ্ট, ঝিলীপর্দায়– রক্ত সঞ্চায়ন ইত্যাদি। অতঃপর অন্তিম খিঁচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে। মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ, যেমন– মুখ, মলদ্বার, যোনিপথ, নাসারন্ধ্র প্রভৃতি দিয়ে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

তীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ
তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু প্রায় ৪৮ ঘন্টা জীবিত থাকে। এ সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা ৪০°–৪১.৭° সে. জ্বর ওঠে। ক্ষুধামন্দা, নিস্তেজতা, পেটফাঁপা, দেহের ঝাঁকুনি, চোখের রক্তাভ পর্দা ইত্যাদি দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত হয় এবং হৃৎপিন্ডের গতি বৃদ্ধি পায়। রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়। অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। দুগ্ধবতী গাভী দুধ দেয়া কমিয়ে দেয় এবং দুধ হলুদ ও রক্তমিশ্রিত হয়। পাকস্থলী আক্রান্তের ফলে ডায়রিয়া ও রক্ত আমাশয় দেখা দেয়। গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয় ,আক্রান্ত গরু একদিনের বেশি জীবিত থাকলে জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি ও যোনিদ্বার ইডিমার কারণে স্ফীত দেখায়।

রোগ নির্ণয় ঃ
নিম্নলিখিত ভাবে এ রোগ নিরূপণ করা যায়। যথা– গবাদি পশুর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মৃত পশুর দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেও রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–
পচন দ্রুত শুরু হয় ও পেটফাঁপা থাকে।দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না। মৃত্যুর পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মরটিস হয় না। সমগ্র দেহে রক্তক্ষরণ, স্ফীত লসিকগ্রন্থি, অন্তপ্রদাহ ও গ্যাসীয় পচন হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ
আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করতে হবে। সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বছরে একবার নির্ধারিত মাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্তণ করা যায়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। এ রোগে মৃত পশুর কোনো ময়না তদন্ত বা কাটাছেঁড়া করা যাবে না। কারণ, জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই স্পোরে পরিণত হয়। তাই মৃত পশুর

দেহের সকল স্বাভাবিক ছিদ্রপথ তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে মরদেহ পচনের সাথে সাথে জীবাণুরও মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এ রোগে মৃত পশুকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাপ্ত কলিচুন সহকারে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটির উপরে কাঁটাজাতীয় কোনো গাছের ডাল পুতে দিতে হবে যেন সেখানে লোকজন বা পশু চলাচল না করে।

স্পোর সৃষ্টির পূর্বেই মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে গরম ১০% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (৬০° সে.) দিয়ে ধৌত করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। ভেটেরিনারি ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধদ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব। আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা, সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে তড়কা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

অ্যানথ্রাক্স মানুষের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র বিন্যাসে প্রকাশ করে।

১) Cutaneous anthrax ঃ সর্বাধিক সাধারণ হল ত্বকের সংক্রমণ। যেখানে লোকেরা সংক্রমিত প্রাণির পরিচর্যা বা প্রাণির মাংস কাটা বা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার স্পোরগুলি ত্বকে কাটা বা স্ক্র্যাচের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং একটি স্থানীয় সংক্রমণ ঘটায় যা নিয়ন্ত্রিত না হলে সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

২) Gastrointestinal anthrax ঃ অ্যানথ্রাক্স সংক্রামিত প্রাণির কম সিদ্ধ রান্না করা মাংস খাওয়ার ফলে এ রোগটি হতে পারে। এটি গলা থেকে কোলন পর্যন্ত গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টকে প্রভাবিত করতে পারে। লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে: বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যাথা, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর। রোগের পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক রক্তাক্ত ডায়রিয়া হয়। গলা ব্যথা এবং খাদ্য গ্রাস করতে অসুবিধা, গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

৩) Inhalation anthrax ঃ কয়েক ঘন্টা বা দিনের জন্য ফ্লুর মতো লক্ষণগুলি যেমন গলা ব্যথা, হালকা জ্বর, অবসন্নতা এবং পেশী ব্যথা। হালকা বুকে অস্বস্তি, নিঃশ্বাসের দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, রক্ত কাশি, বেদনাদায়ক গ্রাস, মাত্রাতিরিক্ত জ্বর, শ্বাস নিতে সমস্যা।

৬) বোভাইন টিউবারকুলোসিস (বিটিবি) ঃ

বোভাইন যক্ষা (টিবি) গবাদিপশুদের একটি সংক্রামক রোগ। এটি মাইকোব্যাক্টেরিয়াম বোভিস (এম.বোভিস) ব্যাকটিরিয়ার কারণে ঘটে যা মানুষ, হরিণ, ছাগল, শূকর, বিড়াল, কুকুরসহ আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণিতে সংক্রমণ এবং রোগের কারণ হতে পারে। গবাদিপশুতে এটি মূলত একটি শ্বাসকষ্টের রোগ তবে ক্লিনিক্যাল লক্ষণগুলি বিরল। মাইকোব্যাক্টেরিয়াম বোভিস এবং মানব রূপ, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস উভয়ের ফলেই মানুষের মধ্যে টিবি হতে পারে।

বোভাইন যক্ষার লক্ষণগুলি ঃ প্রাণিগুলি ধীরে ধীরে পাতলা হতে পারে, হালকা জ্বর আসতে পারে যা ফিরে আসতে থাকে, প্রাণি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্ষুধা কমে যায়। ঘাড়ের লিম্ফ্ নোড গুলি ফোলা ফোলা হয়। ভিজা কাশি থাকবে যা সকালে এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় বা অনুশীলনের সময় বেশী খারাপ হয়

গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণিতে এই রোগ ছড়াতে পারে যেভাবে :
ক) সরাসরি শ্বাসযন্ত্রের পথ দিয়ে খ) সরাসরি সংক্রামিত দুধের মাধ্যমে গ) প্লাসেন্টার মাধ্যমে সরাসরি জন্মের আগে ঘ) পরোক্ষভাবে পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে চ) বাছুরে আক্রান্ত গাভীর দুধ বা কলস্ট্রামের মাধ্যমে বাছুরে সংক্রমিত হতে পারে।

কীভাবে যক্ষা প্রতিরোধ করা যায়?
ক) কিনে আনা বা অন্য খামার থেকে আনা পশুকে কোয়ারান্টাইনে রাখা
খ) অন্যান্য পশুপালের সাথে খামারের গবাদিপশুদের সংস্পর্শ এড়ানো
গ) মানুষ এবং সরঞ্জামের সাথে নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ
ঘ) অন্যান্য খামার থেকে পশুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রন
ঙ) বিশুদ্ধ খাবার ও পানি সরবরাহ
চ) খামারের আক্রান্ত প্রাণি ছাটাই
ছ) নিয়মিত খামারের সকল পশুকে টিবি পরীক্ষা

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

এই রোগটি প্রাণিতে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বোভিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট (বিটিবি) এবং মানুষের মধ্যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মানব টিবি এবং বোভাইন টিবি ব্যাকটেরিয়াগুলির ক্লিনিকাল লক্ষণ এবং ক্ষতগুলি একরকম। রোগটি বেশ অগ্রসর হওয়া অবধি কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। সাধারণ লক্ষণগুলি হল কাশি, ওজন হ্রাস, ক্ষুধামন্দা। সংক্রমিত প্রাণি থেকে দূষিত দুধ পান করে বা সংক্রমিত প্রাণিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষে সংক্রমণ হয়।

৭) লেপটোস্পাইরোসিস ঃ

গরুতে লেপটোস্পাইরোসিস একটি খুব সংক্রামক রোগ। বোভাইন লেপটোস্পাইরোসিস লেপটোস্পাইরা হার্ডজো নামে পরিচিত একটি গ্রুপের দুই ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট। তরুণ বাছুরগুলি তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরুপে বিকাশ করতে পারে না এবং তাই এরা ঝুঁকিতে বেশি থাকে।

মাংস এবং দুগ্ধ উভয়েরই গবাদিপশুতে লেপটোস্পিরোসিস অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রোগ যার ফলস্বরূপ খামারের উৎপাদনশীলতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। লক্ষণগুলির মধ্যে দুধের উৎপাদন হ্রাস, ক্ষুধা হ্রাস, গর্ভপাত এবং নিম্ন উর্বরতার স্তর অন্তর্ভুক্ত। বোভাইন লেপটোস্পিরোসিস একটি জুনোটিক রোগ যার অর্থ এটি মানুষের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং মানুষের লক্ষণগুলি ফ্লুর মতোই। সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভ্যাকসিন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

লেপটোস্পিরোসিসের চিকিৎসা ঃ

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতি। ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকগুলি সাধারণত স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা টেট্রাসাইক্লাইন গ্রুপের। অ্যান্টিবয়োটিক চিকিৎসা না দিলে ব্যাকটিরিয়াগুলি খামারে ছড়িয়ে পড়তে আরও বেশি সময় পাবে। এটি মানুষের জন্য ঝুঁকিও বাড়ায়।

লেপটোস্পিরোসিস প্রতিরোধ

খামারে টিকা প্রদানের মাধ্যমে সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করা হয়। চার মাস বয়সী বাছুরগুলিকে ভ্যাকসিন প্রদান করা যায়। যদি গর্ভাবস্থায় বা ত্রিশ দিন আগে মাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তবে মাতৃ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় ছয় মাস ধরে বাছুরে থাকে।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

লেপটোস্পাইরোসিসের অন্যতম প্রধান হোস্ট গবাদিপশু। দূষিত মূত্র বা জরায়ুর উপাদানগুলির সংস্পর্শে এবং সংক্রামিত গবাদি পশুদের দুধ দিয়ে মানুষের সংক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। বর্ষার মাসে সংক্রমণের হারও বেশি থাকে। মানবদেহে সাধারণ লক্ষণগুলি হল জ্বর, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, জন্ডিস, দেহের ফুসকুড়ি উঠা ইত্যাদি।

সেশন-১৯

ডেইরি প্রাণির ক্ষুরা রোগ ও লাম্পি স্কিন ডিজিজ

(FMD & Lumpy Skin Deasese in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ক্ষুরা রোগ এর কারণ, লক্ষন, প্রতিকার ও প্রতিরোধ
- লাম্পি স্কিন ডিজিজ এর কারণ, লক্ষন, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ক্ষুরা রোগ ঃ

প্রচলিত নাম ঃ ক্ষুরা পাকা, তাপরোগ, খুরুয়া, এঁসো, জ্বরা প্রভৃতি। ক্ষুরা রোগ দ্বি-বিভক্ত ক্ষুরা বিশিষ্ট গবাদিপশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত গবাদিপশুর মুখে এবং গায়ে ঘা হয় এবং দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

রোগের কারণ ঃ এফথো ভাইরাস গোত্রের ভাইরাস ক্ষুরা রোগের জন্য দায়ী। জীবাণুটির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এর ৭টি ভিন্ন ধরনের টাইপ রয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন স্ট্রেইন তৈরী করে । তাই টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য।

রোগের লক্ষণ ঃ

ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত গবাদিপশুর দেহে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ১০৪ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশু খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায় এবং শরীর অবশ হয়ে পড়ে। এসময় মুখ মন্ডলের অভ্যন্তরে প্রদাহ হয়। যার ফলে মুখের ভিতরে জিহ্বা, ঠোঁট, মাড়ি, তালু, স্তনের বাট এবং পায়ের ক্ষুরায় ঘা, ফোস্কা প্রভৃতি দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যু হার খুবই বেশী।

১) মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ দড়ির মত ঝুলানো লালা পড়ে।
২) মুখ ও পায়ের ফোস্কা গলে গিয়ে দগদগে ঘা এর মত দেখায়।
৩) মুখের ও জিহ্বার ক্ষত ফেটে মুখ থেকে সাবানের ফেনার মত লালা বের হয়।
৪) পায়ের ক্ষত ফেটে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ

রোগ প্রতিরোধ অত্যন্ত জটিল। আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে শুকনো স্থানে রাখতে হবে। রুগ্ন পশুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষুরা রোগে মৃত পশুকে ৬ ফুট মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য নিকটস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতাল থেকে ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করাতে হবে।

চিকিৎসাঃ

ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। পশুর মুখে ও পায়ে ঘা হলে হালকা গরম পানিতে ফিটকিরি গুড়ো করে ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ১ গ্রাম/১০লিটার পানিতে এর যে কোন একটি দ্বারা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে।

ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান ঃ Foot & Mouth Disease (FMD) Vaccine

টিকা সংরক্ষণ ঃ ক্ষুরারোগের টিকা অন্ধকার শীতল কক্ষে (কোল্ড রুমে) বা রেফ্রিজারেটরে ৪ ডিগ্রী থেকে ৮ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় প্রস্তুতের তারিখ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কোন অবস্থাতেই এই টিকা ০ ডিগ্রী সেঃ বা তার নিম্ন তাপমাত্রায় (ফ্রিজের বরফ তৈরী অংশে) সংরক্ষণ করা যাবে না।

ব্যবহার বিধি ঃ

(১) প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা ঃ

টিকার নাম	গবাদিপশু	প্রয়োগের স্থান
বাইভ্যালেন্ট	৬ এম এল	চামড়ার নীচে
ট্রাইভ্যালেন্ট	৬ এম এল	চামড়ার নীচে

(২) এ টিকা ৪ মাস পর পর প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রথম ডোজে ২১ দিন পর বুষ্টার ডোজ প্রয়োগ করলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সতর্কতা ঃ

(১) এ টিকা শূন্য ডিগ্রী সেঃ বা তার নীচের তাপমাত্রায় সংক্ষণ করা যাবে না।
(২) গর্ভবতী গাভীকে এ টিকা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।
(৩) চার মাস বয়সের নীচের পশুকে এ টিকা দেওয়া যাবে না।

লাম্পি স্কিন ডিজিজ ঃ

লম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) গবাদিপশু এবং মহিষের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা ত্বকের নোডুলগুলি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং পক্সভিরিডে ক্যাপরি পক্স ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। রোগটি সরাসরি যোগাযোগ, আর্থোপড ভেক্টর এবং সার্জনদের দ্বারা সংক্রামিত হয়। সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এপিজুটিক্স (ওআইই) স্বীকৃত সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়া রোগগুলির মধ্যে এলএসডি গুরুত্বপূর্ণ। জাম্বিয়াতে ১৯৯৯ সালে এই রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয়েছিল। গত ৯০ বছরে বেশিরভাগ আফ্রিকার দেশ, মধ্য প্রাচ্য এবং এশিয়ার দেশগুলিতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৫ সালে, এ রোগটি ইউরোপের মূল ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে এ রোগটি প্রথম শনাক্ত হয়। যা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

লাম্পি স্কিন ডিজিজ এর লক্ষণ ঃ

- প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত প্রাণির জ্বর ১০৪-১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। ফলে ব্যথা, খাবার গ্রহণে অরুচি দেখা দেয়। আক্রান্ত প্রাণির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় গোলাকার গুটি বা ফোস্কা দেখা দেয়।
- পায়ে এবং শরীরের নিম্নাংশ ফুলে পানি জমা হয় এবং প্রাণি খুঁড়িয়ে হাটে।
- শেষ পর্যায়ে কয়েকটি গুটি বা ফোস্কা ফেটে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়।

রোগটি যেভাবে ছড়ায় ঃ

- মশা, মাছি, আঠালী এবং মাইটের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত এক প্রাণি হতে অন্য প্রাণিতে ছড়ায়।
- আক্রান্ত প্রাণি এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহনের মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত প্রাণির লালা ও দুধ এবং আক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শের মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত প্রাণি পরিচর্যাকারী, চিকিৎসক বা ভ্যাকসিন প্রদানকারীর মাধ্যমেও রোগটি অন্য সুস্থ প্রাণিতে ছড়াতে পারে।

রোগের ক্ষতিঃ

আক্রান্ত গাভীর দুধের উৎপাদন কমে যায়, গর্ভপাত হয়, ওজন অনেকাংশে কমে যায় এমনকি বন্ধাত্ব হতে পারে। চামড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং মৃত্যুর হার ১০-১৫%। সঠিক পরিচর্যা ও যত্ন নিলে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই।

লাম্পি স্কিন ডিজিজ এর চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ ঃ

- খামার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
- খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কীট-পতঙ্গ, মশা, মাছি নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারে আক্রান্ত প্রাণির জন্য মশারীর ব্যবস্থা করা।
- আক্রান্ত প্রাণি দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে পৃথকভাবে চিকিৎসা করা।
- আক্রান্ত অঞ্চলে প্রাণির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চারণ ভূমিতে না নেওয়া।
- আক্রান্ত প্রাণির ক্ষতস্থান টিংচার আয়োডিন, পভিসেপ অথবা ০.১% পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্বারা সকাল বিকাল ধৌত করা।

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয় কাজেই কোন এন্টিবায়োটিক এ রোগে কোন কাজ করে না। উপরুন্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে প্রাণি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সেশন-২০

ডেইরি প্রাণির ফডারজনিত জৈব বিষক্রিয়া ও প্রতিরোধ

(Fodder Organic Toxicity in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে ঃ

- গবাদিপশুর ফডারজনিত বিষক্রিয়া
- হাইড্রোসায়ানিক বিষক্রিয়ার কারণ ও বিকাশ
- হাইড্রোসায়ানিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়ার কারন ও বিকাশ
- নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়ার লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা

ফডার বিষক্রিয়া কী ?

বিভিন্ন প্রকার পদার্থ, বিশেষ করে বিষাক্ত জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্য, পানিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও ত্বকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয় এবং পশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটিই বিষক্রিয়া (Poisoning)| পশুর বিষক্রিয়া প্রধানত জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি বিষক্রিয়া পৃথিবীর সকল দেশের গবাদিপশুতে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশু, বিশেষ করে গরু, এ বিষক্রিয়ার ফলে মারা যায়।

বিষের প্রকারভেদ ঃ বিষ প্রধানত দুপ্রকার যথা-

ক. জৈব বিষ খ. অজৈব বিষ

ক. জৈব বিষ (Organic Poisons) ঃ

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, নাইট্রেট ও নাইট্রাইট, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন, অর্গানোফসফেটস ও কার্বামেটস, ইউরিয়া প্রভৃতি।

খ. অজৈব বিষ (Inorganic Poisons) ঃ .

এসব বিষের মধ্যে রয়েছে সিসা, আর্সেনিক, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, মার্কারি, কপার, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সালফার প্রভৃতি।
উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বিষ দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া সম্পর্কে একটি পাঠে এখানে স্ববিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গবাদিপশু সাধারণত যেসব বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ডেইরি প্রাণিতে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়া (Hydrocyanic Acid Poisoning) ঃ

এ বিষক্রিয়ার ফলে দেহের কোষসমূহে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যহত হয়। বিষক্রিয়া তীব্র হলে পশুর শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি এবং অকস্মাত মৃত্যু হতে পারে। বিষক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হলে নবজাতক পশুতে গলগন্ড বা ঘ্যাগ (Goiter) হতে পারে।

কারণ ঃ

তিসি, তিসির খৈল, সদ্য গজানো বাঁশ, ভূট্টা, আখ প্রভৃতি কচি ঘাস খেলেও বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড সম্মৃদ্ধ ঘাস খাওয়ার ফলে পশুতে এ বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কচি ঘাসে এ বিষের পরিমাণ বেশি থাকে। ক্ষুধার্ত পশু দ্রুত এসব ঘাস খেলে সহজেই বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বিষক্রিয়া তীব্র হলে ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

বিকাশ লাভ ঃ

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের কোষসমূহে পৌঁছাতে এবং ব্যবহৃত হতে পারে না। ফলে অক্সিজেন রক্তে জমা হয় এবং রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে। মস্তিষ্কের কোষসমূহ অক্সিজেন স্বল্পতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ কারণে আক্রান্ত পশুর পেশি কম্পন, খিঁচুনি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং অবশেষে মারা যায়। হাইড্রসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়া শরীরে অক্সিজেন ব্যবহার প্রতিরোধ করে।

লক্ষণ ঃ

- ✓ তীব্র মাত্রার বিষক্রিয়ায় পশু ১–২ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। অতিতীব্র মাত্রার বিষক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের ১০–১৫ মিনিটের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং লক্ষণ প্রকাশের ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যে পশু মারা যায়। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, পেশি কম্পন, খিঁচুনি ও চক্ষুতারা প্রসারিত হয়।
- ✓ আক্রান্ত পশুকে অস্থির দেখায়। প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং পেশি কম্পন ও খিঁচুনি দেখা যায়। অবশেষে পশু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়।
- ✓ দৃশ্যমান ঝিলি বা আবরণী উজ্জ্বল লাল দেখায়, তবে মৃত্যুর পূর্বে নীল বর্ণ ধারণ করে।
- ✓ নাড়ির গতি দুর্বল ও দ্রুত গতি সম্পন্ন হয় এবং চক্ষুতারা প্রসারিত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ

- ✓ সায়ানাইড সমৃদ্ধ ঘাস খাওয়ার তথ্য থেকে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রোগলক্ষণ ও পাকস্থলীর খাদ্য পরীক্ষা করে বিষক্রিয়া শণাক্ত করা যায়।
- ✓ রোগলক্ষণ পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ✓ পাকস্থলী থেকে সংগৃহীত অপরিপাককৃত বা অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য (Ruminal or Stomach Content) গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ

১০% সোডিয়াম থায়োসালফেট সলুশন প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩০–৪০ মিলিগ্রাম হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। ইনজেকশন ছাড়াও এ ওষুধ মুখ দিয়ে খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে একটি বড় গরুর জন্য সর্বোচ্চ ৪০–৬০ গ্রাম দেয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ

- ✓ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডসমৃদ্ধ ঘাস খাওয়ানো থেকে পশুকে বিরত রাখতে হবে।
- ✓ ক্ষুধার্ত গবাদিপশুকে দ্রুত বর্ধনশীল সিক্ত বিষ সমৃদ্ধ ঘাস ক্ষেতে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া (Nitrate & Nitrite Poisoning):

কারণ ঃ

- ✓ গবাদিপশু নাইট্রেট বা নাইট্রাইট সমৃদ্ধ ঘাস খেলে এ বিষক্রিয়া দেখা দেয়। নাইট্রেট বিষাক্ত নয়, তবে পাকস্থলীতে প্রবেশের পর নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যব, কচি গম, বার্লি, শ্যামা, হেলেঞ্চা, রোরা প্রভৃতি ঘাস নাইট্রাইট বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- ✓ যব, কচি গম, বার্লি, শ্যামা, হেলেঞ্চা, রোরা প্রভৃতি ঘাস খেলে এ বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- ✓ সরিষা, সয়াবিন, নেপিয়ার, গাজর, তিসি, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্য খাওয়ানো ঝুঁকিপূর্ণ।
- ✓ এছাড়া গভীর নলকূপের পানিতেও এ বিষ রয়েছে।
- ✓ জমিতে অধিক সার ব্যবহার এবং অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে জমির ঘাসে ও ফসলে অধিক পরিমাণে নাইট্রেট জমতে পারে। এ ধরনের জমির ফসল ও ঘাস খাওয়ালে পশুতে এ রকম বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

বিকাশ লাভ ঃ

নাইট্রাইট রক্তে প্রবেশ করার পর হিমোগ্লোবিনকে মিথেমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত করে। ফলে পর্যাপ্ত হিমেগ্লোবিনের অভাবে পশুর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। দেহের ৭৫% হিমোগ্লোবিন মিথেমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত হলে পশু মারা যায়।

লক্ষণ ঃ

- ✓ আক্রান্ত পশুর মুখ থেকে লালা পড়ে এবং পেটের পীড়ার কারণে পেটে লাথি দেয়।
- ✓ উদরাময় ও বমি হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হয় ও দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে।
- ✓ পেশি কম্পন ও দুর্বলতা দেখা দেয়, নাড়ির গতি দুর্বল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়। দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা হ্রাস পেতে পারে।
- ✓ ঘনঘন প্রস্রাব ও গর্ভপাত হতে পারে।
- ✓ নাইট্রেট বিষক্রিয়া হলে অক্সিজেন স্বল্পতার (Anoxia) কারণে ১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয় ঃ

- ✓ বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী ঘাস খাওয়ার ইতিহাস এবং রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ✓ মিথাইলিন ব্লু ইনজেকশন প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, পশু নাইট্রাইট বিষক্রিয়া আক্রান্ত হয়েছিল।

চিকিৎসা ঃ

১. ১% মিথাইলিন ব্লু সলুশন প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১–২ মিলিগ্রাম হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। এ চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রসু। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়ার প্রধান ওষুধ মিথাইলিন ব্লু।
২. বিষক্রিয়া তীব্র হলে ৬ ঘন্টা পর দ্বিতীয় ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
৩. ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ১–২ লিটার হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধে ব্যবস্থা ঃ

- ✓ বিষাক্ত ঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।
- ✓ গভীর নলকুপের পানি খাওয়ানো যাবে না।

সেশন-২১
ডেইরি প্রাণিতে স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার
(Use of Steroid Hormone in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- স্টেরয়েড সর্ম্পকে ধারণা
- ডেইরি প্রাণিতে স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব
- স্টেরয়েড ব্যবহারে আইনগত দিক

স্টেরয়েড কি?

অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে স্টেরয়েড এক ধরনের হরমোন যা গবাদিপশু সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণিতে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন জটিল শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করে। রাসায়নিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী বহু ধরনের স্টেরয়েড হরমোন আছে। তবে মোটা দাগে স্টেরয়েড হরমোনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হল এনাবলিক-এন্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড (এএএস) হরমোন যা জটিল চিকিৎসা কাজে ব্যবহার হয়। এদের অপব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক এ ধরণের স্টেরয়েড হরমোন ফুড এনিমেল বা দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণীতে ব্যবহার সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ। তবে এএএস গ্রুপেরই একটি সিনথেটিক হরমোন হল 'ট্রেনবোলন' যা গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয়। এটি শুধুমাত্র ভেটেরিনারি চিকিৎসকের প্রেশক্রিপসান ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়। গরু জবাইয়ের সর্বোচ্চ দুই মাস পূর্বে সাধারণত ইনজেকশন বা কানের চামড়ার নিচে ইমপ্ল্যান্ট আকারে এটি ব্যবহার করা হয়। মুখে খাওয়ালে এর কোন কার্যকারিতা নেই বরং লিভার ড্যামেজ হয়ে প্রাণির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ট্রেনবোলন মূলত শরীরে নাইট্রোজেন সংশ্লেষ ঘটিয়ে প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে মাংসপেশী বৃদ্ধি করে। এটি একটি জটিল ও ব্যয় বহুল পদ্ধতি বিধায় বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গরু মোটাতাজা করার জন্য ট্রেনবলন ব্যবহার হয় না। তবে এএএস হরমোন দিয়ে কখনও যাতে গরু মোটাতাজা করা না হয় সে ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন এখনই।

গবাদিপশু এবং আমাদের শরীরে আরেক ধরণের স্টেরয়েড হরমোন তৈরি হয় যা করটিকোস্টেরয়েড নামে পরিচিত। করটিকোস্টেরয়েড কিডনির ওপরে অবস্থিত এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে তৈরি হয় ও সরাসরি রক্তে মিশে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ সম্পাদন করে। এছাড়াও এটি স্ট্রেস রেসপন্স বা ধকল সামলানো যেমন ধস্তাধস্তি জনিত বিষক্রিয়া যেমন কিটোসিসের চিকিৎসা ও ক্যান্সারের সহচিকিৎসা ছাড়াও আরো বহুবিধ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। করটিকোস্টেরয়েডকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাইফ সেভিং হরমোনও বলা হয়। গরু মোটাতাজাকরণে বহুল আলোচিত ডেক্সামেথাসন হরমোন কোরটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের একটি সিনথেটিক হরমোন। এটি প্রাকৃতিক হরমোনের চেয়ে প্রায় বিশগুণ শক্তিশালী বিধায় স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার বেশ কার্যকরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এটি অতীব জরুরি ঔষধ হিসেবে তালিকাভুক্ত। প্রাণী ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এটি নিরাপদ বিধায় ফুড এনিমেল অর্থাৎ দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণির চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। করটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের হরমোনের হাফ লাইফ বা অর্ধায়ু অত্যন্ত কম। উদাহারণস্বরূপ, করটিসল এক ধরনের করটিকোস্টেরয়েড যার অর্ধায়ু মাত্র ১ ঘন্টা ৬ মিনিট। অন্যদিকে ডেক্সামেথাসনের অর্ধায়ু প্রায় ৩৬ ঘন্টা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ'র নির্দেশনা অনুযায়ী ডেক্সামেথাসনের উইথড্রয়াল পিরিয়ড শূন্য। অর্থাৎ কোন প্রাণিতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার করলে ওই প্রাণির মাংস বা দুধ খাওয়ার জন্য কোন অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গরু জবাইয়ের পূর্ব মুহূর্তেও ধস্তাধস্তির কারণে এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে প্রচুর পরিমাণে করটিকোস্টেরয়েড নির্গত হয়। নির্গত এসব করটিকোস্টেরয়েড সাথে সাথে রক্তে মিশে যায়। যেহেতু এটি শরীরে কোথাও জমা থাকেনা এবং আমরা রক্ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিনা তাই এতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। তবে মোটাতাজাকরণ কালীন সময়ে মূলত যেসব গরু দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় সেসব গরুতে কিছু মেডিকেল অবস্থায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন প্রাণিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য উভয় বিচারে জবাইপূর্ব ঐসব গরুতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার অত্যাবশকীয় হয়ে পড়ে-যেমন পরিবহনকালীন সময়ে পানিশূন্যতা রোধ, পরিবহনজনীত ব্যথা ও ধকল নিরাময়, অনাহারের পর অতিরিক্ত দানাদার খাদ্যের দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া হতে কোরবানীর গরুকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। ডেক্সামেথাসনের এই ব্যবহার মোটাতাজাকরণ সম্পর্কিত নয় এটি চিকিৎসা সম্পর্কিত। তবে পরিবহণকালিন যে কোন অবস্থারই সৃষ্টি হোক না কেন, ডেক্সামেথাসন একটি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ব্যতিত এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করা উচিত নয়। এর অপব্যবহার বহুবিধ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ ও সতর্কতা প্রয়োজন।

স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার দোষের নয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের ফার্মেসিগুলোতে গিয়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যে কেউ এসব স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ কিনতে পারেন। ফলে

অবৈধ উপায়েও স্টেরয়েড ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে শতকরা কত ভাগ গরুতে এর ব্যবহার হচ্ছে তার কোন পরিসংখ্যান জানা নেই। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষকরাও অধিক লাভের আশায় গরু মোটাতাজা করতে অনেক উচ্চমাত্রায় দীর্ঘদিন স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার করছেন। মানুষের বেলায় যেমন দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদি পারিপার্শ্বিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তেমনি পশুর ক্ষেত্রে ও একই সম্ভাবনা থেকেই যায়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে গরুর শরীরে চর্বি জমে। ফলে গরুর দেহের আকার বেড়ে যায় কিন্তু তুলনামূলক ওজন হ্রাস পায়। উক্ত গরুর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে যায়। এবং উক্ত পশুকে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে অসুস্থ মনে হয়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে পশুর অতিরিক্ত তৃষ্ণা পায় এবং প্রশ্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে কোষে পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। এবং দৃশ্যত গরুকে মোটা দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সকল গরুর মাংসের পরিমাণ বেশি হলেও তার গুণগতমান অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে স্টেরয়েড হরমোনের কারণে গরু ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগতে থাকে। দীর্ঘদিন উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড ঔষধ ব্যবহার করা হলে তা শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কান্ত হবার আগেই জবাই করে হলে মাংসের মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে চলে যায়। এই জাতীয় গরুর মাংস যদি মানুষ নিয়মিত গ্রহণ করে, তাহলে মানুষের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধমনী চিকন হয়ে হৃদরোগ এমনকি ব্রেন স্টোক হতে পারে। এ সকল হরমোন এতটাই মারাত্মক যে মাংস রান্না করার পরও নষ্ট হয় না। ফলে তা মানুষের শরীরে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি, কিডনি ও লিভারসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি করে।

অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব, মেয়েদের অল্প সময়ে পরিপক্কতা এবং শিশুদের অল্প বয়সে মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এ সকল স্টেরয়েড হরমোন। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা পশুর মাংস হয়তো দুই-এক দিন খেলে কিছু হবে না। কিন্তু নিয়মিত খেলে, কিংবা অভ্যাসে পরিণত হলে বিভিন্ন হাসপাতালের রোগির সংখ্যা বাড়ে। বেশি বেশি মাংস খেয়ে পেটের পীড়াসহ হৃদরোগে আক্রান্ত এমনকি স্ট্রোক হয়ে প্রচুর রোগি হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে ঈদের সময় হাসপাতালে অধিক পরিমাণ মাংস গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। যাইহোক মাংসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ স্টেরয়েড ঔষধ মানুষের দেহে আসলে যে সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে সেগুলো হল ক) যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া। খ) রক্তে কোলেস্টরল বৃদ্ধি গ) ত্বকে ব্রণ জাতীয় ক্ষত সৃষ্টি ঘ) টাক পড়ে যাওয়া ঙ) রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর বিরুপ প্রভাব চ) মহিলাদের দেহে পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ ছ) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া জ) পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থিও স্ফীতি ঝ) রক্ত চাপ বৃদ্ধি পাওয়া ঞ) বৃক্কের সমস্যা ট) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ঠ) পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়া এবং ড) দেহের হরমোনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

স্টেরয়েড ব্যবহারে আইনগত দিক ঃ

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্য গবাদিপশুতে স্টেরয়েড প্রয়োগের সুযোগ নেই। 'মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' (২০১০ সালের ২ নং আইন) ১৪ নং ধারা অনুযায়ী পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশক অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোন ব্যাক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করেন তবে উক্ত আইনের ২০ নং ধারা অনুযায়ী সেই ব্যাক্তি অনুরুপ অপরাধের জন্য এক বছরের কারাদন্ড, বা অনূর্ধ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। তাছাড়া 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) এর ১৪ নং ধারার বিধি মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী পশু পরিবহন ও বিপণন করতে হবে। উক্ত আইনের ২১ (গ) নং ধারার বিধান মোতাবেক কারকাস, কারকাসের অংশ, মাংস প্রভৃতিতে জীবাণু, ভারী ধাতব বস্তু, বিষাক্ত বস্তু, হরমোন, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন প্রথমবার লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি অনূধ্ব এক বছর কারাদন্ড অথবা অনুর্ধ্ব ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। উপযুক্ত আইনদ্বয় ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় দন্ডনীয় অপরাধ। প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দন্ড হল অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অনূন্য এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অনূন্য তিন লক্ষ অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

NORMAL GRASS FED COW

GROWTH HORMONE + ANTIBIOTICS + CORN FED

সেশন-২২

ডেইরি প্রাণির রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

(Disease Prevention and Health Management in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ডেইরি খামারে সংক্রামক রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধ
- ডেইরি খামারে ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচী
- ডেইরি খামারে প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ডেইরি খামারে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ঃ

রোগ বিস্তারের কারণ ঃ

অসুস্থ্য গবাদি পশুর পায়খানা প্রসাব, লালা, চোখের/নাকের পানি, কাঁশি এবং এসব হতে নি:সৃত তরল পদার্থ দ্বারা রোগজীবানু বের হয়ে যে কোন খাদ্য, যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক জিনিসপত্র দূষিত করতে পারে। বাতাসে বাহিত হতে পারে এমনকি মাটি, পানি দূষিত করে ছড়াতে পারে। দূষিত বস্তুতে রোগ-জীবাণু অনেক দিন বিশেষ করে তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগের জীবাণু ২০ বৎসর পর্যন্ত মাটিতে সক্রিয় থাকতে পারে। ক্ষুরা রোগের জীবাণু অনকূল বাতাসের মাধ্যমে কয়েক মাইল দূরেও সক্রিয অবস্থায় যেতে পারে।

রোগ-জীবাণু কিভাবে প্রাণির শরীরে প্রবেশ করে ঃ

- ✓ দূষিত বায়ু, পানি ও খাদ্য গ্রহন করলে, খাদ্যের পাত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি অপরিস্কার অবস্থায় ব্যবহার করলে জীবাণু খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে।
- ✓ পোকা-মাকড় যথা ঃ মশা-মাছি, আঠালী ও উকুনের আক্রমনের ফলে রক্ত শোষনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।
- ✓ সুস্থ্য গবাদি পশু অসুস্থ্য গবাদি পশুর সংস্পর্শে আসলে ও প্রজননের মাধ্যমে।
- ✓ বাছুরের দেহে মায়ের দুধের মাধ্যমে বা গর্ভাবস্থায় প্লাসেন্টাল রক্তনালীর মাধ্যমে।
- ✓ ইনজেকশন/ভ্যাকসিনের সময় একই সূঁচ অসুস্থ্য ও সুস্থ্য উভয় প্রাণীতে ব্যবহার করলে।

রোগ বিস্তারের সহায়ক কারণসমূহ ঃ

- ✓ বাতাসে আর্দ্রতা (৮০% ভাগ পানি), তাপমাত্রা (২৬ ডিগ্রী সেঃ) ও পারিপার্শ্বিক নোংরা অবস্থা।
- ✓ পুষ্টির অভাব অর্থাৎ গবাদিপশু পরিমিত খাদ্য না পেলে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শীত জনিত কারণে শরীর দুর্বল হলে।
- ✓ কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় শরীরের শক্তি কমে গেলে।
- ✓ গর্ভবতী অবস্থায় সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি না পেলে গাভী ও তার পেটের বাচ্চা সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে।
- ✓ শরীরে রোগ জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে উক্ত রোগের লাইভ/ইনএকটিভেটেড ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হলে।
- ✓ গবাদিপশুর আবাসস্থলে বা চারণ ভুমিতে বন্য/অন্যান্য জীবজন্তু পাখি, পোকমাকড়, মশা, মাছি কেঁচো ইত্যাদি অবাধে চলাফেরা করলে বা বেশী পরিমানে/সংখ্যায় থাকলে রোগ জীবাণু সহজেই বিস্তার লাভ করে।
- ✓ মৃত গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি মাঠে, নদী, ডোবায় বা রাস্তার ধারে ফেলে রাখলে।
- ✓ পরিবহনের সময় সঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে, পরিবহন নোংরা থাকলে এবং একই বাহনে সুস্থ্য ও অসুস্থ্য প্রাণী বহন করলে।
- ✓ হাট বাজারে বা বন্যার সময় গাদাগাদি করে বা অপরিস্কার অবস্থায় সুস্থ্য ও অসুস্থ্য গবাদিপশু একসাথে জড় করলে।

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

১। নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন পশুর কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।

২। বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় জুতা পরিবর্তন এবং জীবাণুনাশক পদার্থ গুলানো পানিতে পা ডুবিয়ে নিতে হবে।

৩। যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মত দিতে হবে। নিজের

খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী খামার বা পশু সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪। প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।
৫। কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার পশু পাখী বা পশু পাখী জাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬। খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি ইঁদুর ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।
৭। খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে, ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে প্রাণি চিকিৎসকের মতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে পশুর মরদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ ঃ

১। পৃথকীকরণ ঃ খামারে বা কোন বাড়িতে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত প্রাণি পৃথক করতে হবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রাণির কাজ কর্ম করার জন্য যদি একজন লোকই থাকে তবে প্রথমে সুস্থ পশুর কাজ কর্ম ও খাদ্য প্রদান করে অসুস্থা বা আক্রান্ত প্রাণির সেবা করতে হবে। যদি কোন প্রাণি রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ হয় তাকে পৃথক করে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

২। আক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা অথবা নির্মূল করণ ঃ যে সকল রোগের চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যায় সে সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু যে রোগের চিকিৎসা করলেও পরিপূর্ণভাবে ভাল হয় না এবং রোগের বাহক হিসাবে পশুটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব পশুকে জবাই করে মৃতদেহ পুঁড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে।

৩। রোগাক্রান্ত এলাকর প্রাণি বিক্রয় না করা ঃ রোগ দেখা দিলেই অনেক লোকের মধ্যে রোগাক্রান্ত পশু পাখী বাজারে বিক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়, এর ফলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ প্রবণতা অবশ্যই রোধ করতে হবে। রোগাক্রান্ত এলাকার পশু পাখী যেন বাজারের বা রাস্তায় বের না হতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। রোগাক্রান্ত প্রাণি ও তার পরিচর্যা ঃ রোগাক্রান্ত পশুর সেবা বা আনুসাংগিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন লোক দ্বারা করানোই ভাল। রোগাক্রান্ত পশুর ঘরের সমস্ত কিছু পৃথক থাকতে হবে এবং তা সুস্থ প্রাণির ঘরে কখনই আনা যাবে না। রোগক্রান্ত প্রাণির ঘরে ময়লা, আবর্জনা, খড়-কুটা সবই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম না হলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতিদিন ঘরে সুবিধাজনক কোন জীবাণু নাশক যেমন- স্যাভলন, আইওসান, ফিনাইল বা ডেটল ব্যবহার করতে হবে।

৫। মৃত দেহের সৎকার ঃ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণি মারা গেলে তার দেহে প্রচুর পরিমাণে সংশিষ্ট রোগের জীবাণু থাকে। রোগে মারা প্রাণির মৃতদেহ পুঁড়িয়ে ফেলাই উত্তম না পারলে অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। মৃত প্রাণির ঘরের সকল আসবাবপত্র সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কিছু এমনকি ঘরের দেওয়াল, বেড়া, সিলিং, সব কিছু জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং এই ঘরের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন সুস্থ প্রাণি না তুলে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। মৃত প্রাণি ঘর থেকে বের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর দেহ থেকে কোন পদার্থ না পড়ে। এই সকল পদার্থে প্রচুর জীবাণু থাকে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত দেহ মাটিতে পোঁতার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন কুকুর, শেয়াল বা অন্য কোন বন্য জন্তু তা তুলে না ফেলে। মাটি চাপা দেওয়ার আগে মৃত দেহের উপর চুন, সোডা অথবা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

৬। প্রচারঃ সংক্রামক রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এলাকার জন সাধারণকে সে রোগ সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য ঢোল, মাইক, প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকায়, বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ খামার পরিচালনার জন্য খামারের গবাদিপশুর নিয়মিত টিকা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশুচিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক কার্যকর টিকা দেওয়ার সময়সূচীর নির্দ্ধারন করা উচিত।

দুগ্ধ খামারে গবাদিপশুর সাধারণ ভ্যাকসিনগুলি হল অ্যানথ্রাক্স, বাদলা, গলাফুলা রোগ, বোভাইন প্যাস্তরোলোসিস, ক্ষুরা রোগ, রেবিস, সংক্রামক বোভাইন নিউমোনিয়া।

ডেইরি খামারে ভ্যাকসিন কর্মসূচী ঃ

Type of vaccines	Age of vaccination	Rout of administration	Dosage	Immunity development after vaccination	Imm nity lasting period	Revaccination time
Anthrax	>3 months	Subcutaneous	1ml	After 10 days	1 year	Every year
Black Leg	>3months	Subcutaneous	2ml	After 10 days	1 year	Every year
B.Pasteurollosis	>3months	Subcutaneous	2ml	After 10 days	6-8 months	6 months
FMD (Tri/Tetra valent)	>6months	Subcutaneous	4ml	After 2 weeks	6 months	6 months

খামারে গরুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চেকলিস্ট ঃ

আচরণ ঃ পাল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে গরুর আচরন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গরু কীভাবে তারা খাচ্ছে, গুঞ্জন করছে, হাঁটাচলা করছে, মনোযোগ দিচ্ছে ইত্যাদি। সবসময় শুয়ে থাকা, খাদ্য না খাওয়া এবং হতাশা অসুস্থতার লক্ষণ এবং তার জন্য বিশদ ক্লিনিকাল পরীক্ষার প্রয়োজন।

দাঁড়ানো বা হাঁটার ভঙ্গি ঃ সঠিকভাবে দাঁড়ানো পিঠটি সোজা হওয়া উচিত (উপরের দিকে বাঁকানো ব্যথাকে বুঝায়) হাঁটার সময় খোঁড়ানো ল্যামিনাইটিস বা ক্ষুর পচা রোগ বুঝায়।

রুমেন পূরণ ঃ সাধারণত স্বাস্থ্যকর গরুর রুমেন পূর্ণ হয়। যদি রুমেন গোল-গাল না হয় বুঝতে হবে গাভী অসুস্থ বা সঠিক খাওয়ানো হয় না।

শারীরিক অবস্থার স্কোর ঃ গরুর স্বাস্থ্য পরিচালনায় শারীরিক অবস্থার স্কোরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। স্তন্যদানের শুরুতে একটি গাভী কিছুটা ওজন হারাতে পারে তবে আপনি সম্ভবত স্তনের শেষে তিনটি পাঁজরের বেশি গুনবেন না।

শরীরের তাপমাত্রা ঃ গরুর শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পরিবর্তিত হয়। কোনও সংক্রমণের উপস্থিতি যাচাই করার জন্য শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। খুব উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন।

নাড়ির হার ঃ সাধারন গরুর নাড়ির হার প্রতি মিনিটে ৪০ থেকে ৬০ পাল্‌স এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঃ চোখ, ভালভা এবং মুখের চারপাশে শ্লেষ্মা ঝিল্লির ভিজ্যুয়াল পরীক্ষাটি ব্যাবসিওসিস, অ্যানিমিয়া বা লিভারের রোগের মতো রোগগুলি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাদা রঙের শ্লেষ্মা ঝিল্লি রক্তাল্পতা নির্দেশ করে।

রুমেন গতিশীলতা ঃ হজম সিস্টেমের নিয়মিত সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য রুমেন গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ রুমেনের গতিশীলতা প্রতি মিনিটে ২-৩ বার। এটি গরুর বাম প্রান্তে হালকা চাপ প্রয়োগ করে করা হয়। রুমেন চলাচলের অনুপস্থিতি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ।

দুগ্ধ খামারের প্রানির স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ:

দুগ্ধ প্রাণির স্বাস্থ্যের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এবং তাদের মানদণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। মানদণ্ডগুলি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত । নীচে চেকলিস্টগুলি ব্যবহারের জন্য একটি গাইডলাইন এবং স্থানীয় পরিস্থিতিতে এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

1. Dairy cattle health signs (individual cow)

Criteria dairy cattle health signs (individual cow)	Score	Benchmark
1. Body temperature		38 - 39°C
2. Breathing frequency		12- – 16 times per minute
3. Pulse rate		40 – 60 pulses per minute
4. Hair		Shiny and smooth
5. Mucosa		Pink and shiny
6. Legscore		1 to 3
7. Rumenfill		Filled
8. Body Condition Score		Depending on lactation period
9. Rumen movements:		2 per minute
10. Appetite		Willing to eat concentrate
11. Posture and gait		Straight, not crippled
12. Behaviour		Attentive
13. Temperature ears		Warm

2. Dairy cattle health signs (herd group)

Criteria dairy cattle health signs (herd group)	Score (1 to 5)	Benchmark
1. Average Body Condition Score		In average ≥3
2. Posture and gait		No cripple cattle
3. Rumenfill		Filled
4. Hair		Shiny and smooth
5. Manuel score		Smooth, consistent and shiny
6. Leg score		1 to 3
7. Rumenfill		Filled
8. Body Condition Score		Depending on lactation period
9. Behaviour		70% resting and laying down Majority ruminating
10. Appetite		Willing to eat concentrate
11. Posture and gait		Straight, not crippled
12. Behaviour		Attentive
13. Area around vulva		Clean

3. Farm Checklist Health hazards

Farm Checklist Health hazards	Good	Satisfactory	Improvemnts required	Immediate action necessary
Milking				
Milking place				
Quality of the floor				
Hygiene of the floor				
Hygiene of the walls				
Pest and insect control system				
Hygiene of milk equipment				
Hygiene of milk storage equipment				
Personal hygiene				
Preparation of udder				
Milking technique				
Post milking				
Stable				
Quality of floor				
Quality of bedding				
Hygiene floor				
Hygiene bedding				
Cleanliness of cattle				
Drinking water				
Quality of drinking water				
Quality of drinking troughs				

4. Farm Checklist Health hazards

Farm Checklist Health hazards	Good	Satisfactory	Improvements required	Immediate action necessary
Hygiene of troughs				
Cleanliness of water				
Feed				
Storage facility				
Cleanliness of storage facility				
Freshness of concentrates				
Freshness of forage				
Pest control				
Presence of moulds in feed				
Calving				
Quality of calving place				
Quality of bedding				
Hygiene of calving place				
Hygiene around calving				
Disinfection of umbilical cord				
Cattle traffic				
Entrance of bought animals				
Exit of sold animals				
Disposal of carcasses				
Prevention of diseases				
Vaccination scheme				
Tick control				

সেশন-২৩

টিকার গুণগতমান রক্ষায় কুল চেইন ব্যবস্থাপনা

(Cool Chain Management of Vaccine for Quality Control)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কুল চেইন সর্ম্পকে ধারণা
- কুল চেইনের ধাপ ও যন্ত্রপাতিসমূহ
- কুলচেইন ব্যবস্থাপনায় টিকা পরিবহন ও সংরক্ষণ
- টিকা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এবং প্রয়োগ সতর্কতা

কুল চেইন ঃ

কোন ধরনের বিরতি ছাড়াই সব সময় অনুকূল পরিবেশে ভ্যাকসিন পরিবহন অর্থাৎ ভ্যাকসিনের উৎপাদনের সময় থেকে শুরু করে টিকাদানের পূর্ব পর্যন্ত টিকার জন্য অনুকূল ঠান্ডা পারিবেশ বজায় রাখার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাকেই কুল চেইন বলা হয়।

কুলচেইনের ধাপ ও যন্ত্রপাতিসমূহ ঃ

কুল চেইনের ধাপ বলতে আমরা সাধারণত ভ্যাকসিন ব্যবহারের আগ পর্যন্ত কত হাত ঘুরে কিংবা কোথায় কত দিন স্টোর করে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হচ্ছে তার ধাপকেই বুঝি। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত টিকা এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত টিকা কিভাবে একটি খামারে ব্যবহার হয় তার নমুনা প্রদান করা হলো।

	দেশীয় উৎপাদিত টিকা	বিদেশ থেকে আমদানীকৃত টীকা	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান	টিকা প্রস্তুতকারক দেশ	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	কেন্দ্রীয় টিকা সংরক্ষণ	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	বিভাগীয় পর্যায়	কেন্দ্রীয় কোল্ড স্টোরেজ (ঢাকা)	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	জেলা পর্যায়	বিভাগীয় ডিপো/বিক্রয় কেন্দ্র	
	↓	↓	পরিবহন
পরিবহন		আঞ্চলিক ডিপো	
	উপজেলা পর্যায়	↓	পরিবহন
		বড় ঔষধের দোকান	
	পরিবহন ↓	↓	পরিবহন
	খামার		
		ছোট ঔষধের দোকান	
	খামার	পরিবহন	

কুল চেইনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ

কুল চেইন মেইনটেনেন্স বা সংরক্ষণ করতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজ সরঞ্জাম এবং মজুদ কক্ষ প্রয়োজন হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

●কোল্ড রুম ●ফ্রিজার রুম ●রেফ্রিজারেটর রুম ●ডিপ ফ্রিজার ●আইস প্যাক ● ফ্রিজার ●কোল্ড বক্স ●ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ●রিফ্রিজারেটেড ট্রান্সপোর্ট ●থার্মোমিটার ●ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ●কোল্ড চেইন মনিটর কার্ড

কুলচেইন ব্যবস্থাপনা তদারকি ও টিকা পরিবহন ঃ

কুলচেইন ব্যবস্থাপনা তদারকি করার জন্য গৃহীতব্য সতর্কতাসমূহ:-

- যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তবে তার কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে এবং যদি বিদ্যুৎ ৪/৬ ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে তবে দুঃচিন্তা মুক্ত থাকা যাবে। তবে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ আসার পর পর্যন্ত রেফ্রিজারেটরের ঢাকনা বন্ধ রাখতে হবে। যদি উন্নত মানের রেফ্রিজারেটর হয় (আইস লাইন রেফ্রিজারেটর) সেই ক্ষেত্রে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকলেও অসুবিধা নেই।
- বিদ্যুৎ আসতে দেরী হলে তবে রেফ্রিজারেটর হতে আইস প্যাক এবং ভ্যাকসিন বের করে কোল্ড বক্সে সাজিয়ে রাখতে হবে। সঠিকভাবে ভ্যাকসিন এবং আইস সাজিয়ে রাখলে এবং ভালভাবে এয়ারটাইট হলে এক নাগারে তিন দিন পর্যন্ত টিকা কোল্ড বক্সে রাখা যায়, এতে টিকার মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
- সব সময় কিছু অতিরিক্ত ফ্রোজেন আইস প্যাক রাখতে হবে, যাতে বিপদের সময় কাজে লাগে।
- সব সময় অন্য প্রতিষ্ঠানের বা বাড়ীর কর্তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে হবে যাদের রেফ্রিজারেটর সুবিধা আছে। সামাজিক সম্পর্ক কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনায় অনেক ভূমিকা রাখে।
- সব সময় ভাল এবং দক্ষ রেফ্রিজারেটর টেকনিশিয়ান এবং ইলেকট্রিশিয়ান এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে যাতে তারা দ্রুত ছোট সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।
- যারা সব সময় রেফ্রিজারেটর কিংবা জেনারেটর ভাড়া দেয় এমন লোকের সঙ্গে আলাপচারিতা রাখতে হবে।
- যে কোন জরুরী অবস্থায় বা স্বাভাবিক কিছু খুচরা যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ স্টকে রাখতে হবে। যেমন: স্টারটিং রিলে, ওভার লোড প্রটেক্টর, থার্মোস্ট্যাট, থ্রিপিন প্লাগ, থ্রিপিন সকেট, ফিউজ, বৈদ্যুতিক তার , কাট আউট, টেস্টার, ক্রু ডাইভার, প্লাস, স্লাই রেঞ্জ ইত্যাদি।

টিকা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এবং টিকা ব্যবহার ও প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে উন্নত মানের টিকা ব্যবহারের পরও টিকায় প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয় না।

- যে রোগের টিকা দেয়া হয় যদি প্রাণি সেই রোগের জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ রোগের সুপ্তাবস্থায় থাকে।
- প্ল্যাসেন্টা বা প্রসবকালীন দুধের মাধ্যমে মা থেকে বাচ্চায় প্রাপ্ত অ্যান্টিবডির উপস্থিতি টিকার কার্যকারিতায় বাধা দেয়।
- কোন প্রাণি বংশগত কারণে টিকায় প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হতে পারে।
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে।
- অত্যধিক পরজীবী আক্রমণে প্রাণির দেহে প্রোটিন সৃষ্টিতে ব্যঘাত ঘটায় এসব প্রাণিতে টিকা ভালভাবে কার্যকর হয় না।
- মৃত টিকাবীজ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকায় পর্যাপ্ত প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না।
- ব্যবহৃত টিকার জীবাণু স্ট্রেইন বা প্রাণির আক্রান্ত জীবাণুর স্ট্রেনের পার্থক্য হলে।
- নির্দেশনামত টিকা সংরক্ষণ করা না হলে।
- টিকা পরিবহনের সময় কোল্ড চেইন পালন করতে করতে ব্যর্থ হলে।
- দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা রোগাক্রান্ত প্রাণিতে টিকা প্রয়োগ করলে।
- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় টিকা প্রয়োগ করলে টিকার কার্যক্ষমতায় ব্যঘাত ঘটতে পারে, যার ফলে টিকা ব্যর্থ হয়।

টিকা ব্যবহার ও প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

- প্রতিষেধক টিকা সবসময়ই সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান পশু-পাখিতে প্রয়োগ করতে হয়।

- রোগাক্রান্ত প্রাণিকে টিকা প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ এতে কাঙ্খিত মাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না।
- ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবর্তী প্রাণিকে কোন টিকা দেওয়া উচিত নয়।
- টিকার বোতল বা ভায়াল কোন অবস্থাতেই সূর্যালোকে আনা ঠিক নয়।
- প্রয়োগের জন্য টিকা প্রস্তুতকরণের সময় মিশ্রণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাত্র, সিরিঞ্জ-নিডল, ডাইলুশনের জন্য ব্যবহৃত ডাইলুয়েন্ট, ব্যবহারকারীর হাত ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।
- টিকা মিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত পাত্রে জীবাণুনাশক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- সকালে ও সন্ধ্যায় টিকা মিশ্রণ ও প্রয়োগ করা উচিত।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ বা টিকার সাধারণ রং পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে টিকা আর ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে কুল চেইন বা ঠান্ডা অবস্থায় পরিবহন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- তাপ প্রতিরোধক কুল-ভ্যান বা কন্টেইনার বা ফ্লাক্সের মধ্যে বরফ দিয়ে টিকা পরিবহন করতে হবে। বরফ গলে গেলে পুনরায় বরফ দিতে হবে।
- টিকা প্রয়োগের সময় টিকা মিশ্রণের বোতল বা ভায়াল ছায়াযুক্ত স্থানে কুল বক্সের মধ্যে রাখা উচিত।
- ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিশেক টিকা প্রয়োগকালে প্রয়োগ স্থানে পরিশ্রুত পানি দ্বারা পরিস্কার করে নিতে হবে এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা মোতাবেক টিকা প্রদান করা উচিত।

টিকাবীজ পরিবহন ঃ

বাংলাদেশে অধিকাংশ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বানিজ্যিক খামারগুলি টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ টিকা বহন করতে হয়। এটা cool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই পশু-পাখিকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১. টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত পরিবহন করা যায়। তবে বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।

২. বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (cool room) রেখে স্থানান্তর করতে হবে।

৩. থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে করে বেশি সময় ধরে পরিবহনের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাক্সে রাখতে হবে।

৪. টিকা কুলবক্সের বা ফ্লাক্সের বাইরে বের করে থইং (thawing) বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাক্সে বরফ থাকতে হবে।

৫. টিকার সঠিক পরিবহনের ওপর নির্ভর করে এর অপচয় ও ঘাটতি। খুব কম সময়ের জন্য টিকাবীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

টিকাবীজ সংরক্ষণ ঃ কুল চেইন রক্ষায় টিকাবীজ সঠিকভাবে এবং সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

গবাদিপশুর টিকাবীজ সংরক্ষণের নিয়মাবলী ঃ

ক্রমিক	টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি ও মেয়াদ
১	তড়কা	৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
২	বাদলা	৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
৩	গলাফুলা	৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
৪	ক্ষুরা-বাই/ট্রাইভ্যালেন্ট	৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
৫	জলাতংক	- ২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বৎসর, - ৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস, ২°-৮° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস

টিকাবীজ সংরক্ষণ ও কুল চেইন মনিটরিং

সেশন-২৪

ডেইরি প্রাণির জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

(Bio Security Management in Dairy Herd)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- বায়োসিকিউরিটি কী?
- জীবাণুমুক্ত করনের বিভিন্ন পদ্ধতি
- ফিউমিগেশন পদ্ধতি
- বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় ফুটবাথের ব্যবহার

বায়োসিকিউরিটি কী?

বায়োসিকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা যা নানা ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে একটি খামারের মধ্যে অথবা আন্তঃ খামারের মধ্যে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রোগ জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করে। বায়োসিকিউরিটি হল প্রথম লাইনের প্রতিরক্ষা যা খামারে প্রবেশ করা নতুন রোগ প্রতিরোধ করে তাই বায়োসিকিউরিটি লঙ্ঘন হলে খামারে রোগের প্রবর্তনের ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

খামারের জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে করনীয়-

- বাহিরের প্রাণি প্রবেশ করলে বা ক্রয় করলে কমপক্ষে ১৫-৩০ দিন পৃথক করে লাখতে হবে।
- খামারের কোন প্রাণি অসুস্থ হলে তাকে পৃথক সেডে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।
- খামারের গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- বাহিরের লোক জনের অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত বন্ধ করতে হবে।
- খামারের মৃত প্রাণি যথাযথভাবে সৎকার করতে হবে।
- বিশুদ্ধ ও জীবানুমুক্ত পানি ও খাবার সরবরাহ করা।
- খামার ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে বায়োসিকিউরিটি কিট ব্যবহার করতে হবে।
- খামারের বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, ব্যবহার্য্য উপকরন নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- বন্য প্রাণি ও পাখির প্রবেশ বন্ধ করা।
- পোকামাকড় ধ্বংস করা।
- জীবানু ধ্বংসের বিভিন্ন পদ্ধতি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা।
- খামারে আলো বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা। স্যাঁতস্যাতে অবস্থা মুক্ত করা।

জীবাণুমুক্ত করনের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন প্রকারের রোগ বালাই প্রতিরোধ করা।
- রোগবালাই জনিত ক্ষতি হ্রাস করে খামারকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা।

জীবাণুমুক্ত করনের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

১) ফিউমিগেশন সাধারনত ফরমালিন ও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করে জীবাণুনাশ করার পদ্ধতিকে ফিউমিগেশন বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য-

- ফরমালিন- ৫২.৫ গ্রাম,
- পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ১০৫ গ্রাম
- মাটির পাত্র- যে পরিমান ঔষধ হবে তার ৩-৪ গুণ বেশি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ও চ্যাপ্টা হবে

পদ্ধতি ঃ

- ঘরের জানালা দরজা ভালভাবে বন্ধ করে নিতে হবে।
- যে ব্যাক্তি ফিউমিগেশন করবেন তাকে রাবারের হাতমোজা ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হবে।
- মাটির পাত্রে ফরমালিন দিয়ে তাতে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশাতে হবে।
- এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- তারপর ঘরের জানালা দরজা খুলে দিতে হবে এবং ধোয়া সম্পূর্ন রূপে বের হলে ঘরটি ব্যবহার করতে হবে।

২) ফুটবাথ ব্যবহার ঃ

খামারের ঢোকার পথে জীবাণুনাশক দিয়ে পা ধৌত করণের পদ্ধতিকে ফুটবাথ বলে।
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ০.০১% দ্রবণ

পদ্ধতি ঃ

- খামারে ঢোকার পথে আয়তাকার ৩-৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সিমেন্ট দিয়ে আস্তর দিতে হবে।
- এই গর্তে ০.০১% পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ঢেলে দিতে হবে।
- খামারে প্রবেশকারী এই দ্রবণে পা চুবিয়ে খামারে প্রবেশ করবে।
- এই পদ্ধতি জুতা বা পায়ে লেগে থাকা রোগজীবাণূ ধবংস হয়।

৩) জীবানুনাশক স্প্রে ঃ খামারকে জীবানুমুক্ত করতে নিয়মিত শেড, নর্দমা, রাস্তা এবং বিভিন্ন কক্ষ জীবানুনাশক স্প্রে করতে হবে।

৪) পরিষ্কার পরিচ্ছনকরন ঃ খামারের শেড, নর্দমা, খামারের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া খামারের আগাছা নিয়মিত দমন করতে হবে।

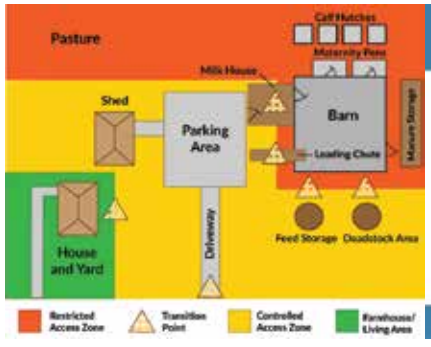

সেশন-২৫

ডেইরি প্রাণির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বায়োগ্যাস ও বায়োকম্পোষ্ট তৈরী

(Farm Waste Management : Bio Gas and Bio Compost Production)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহারের সুবিধা
- বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরন
- ফাইবার বায়ো-ডাইজেস্টার এর সুবিধা
- বায়োকম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার
- বায়ো-স্লারি সংগ্রহ ও ব্যবহার

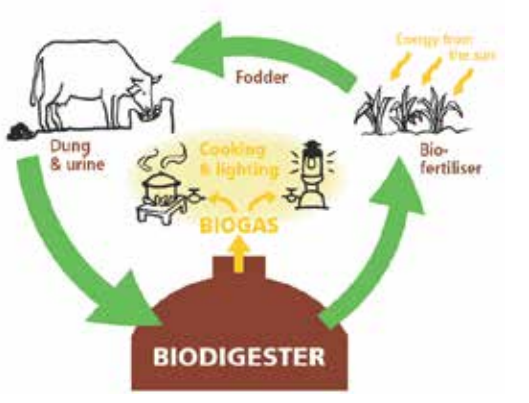

খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ খামারের বর্জ্য (গোবর, মূত্র, পশুখাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ, লিটার ইত্যাদি) স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনায় প্রধান অন্তরায়। খামারের বর্জ্য থেকে এ্যামোনিয়া, মিথেন গ্যাস তৈরী হয় যা গ্রীন হাউজকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। খামারের বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণ এবং ডি-কম্পোজ করতে না পারলে খামারের পরিবেশ নোংরা, দুর্গন্ধ এবং মশা মাছির উপদ্রব দেখা দেয় ফলে একদিকে যেমন প্রাণির স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়ে অন্য দিকে এলাকার পরিবেশ দূষিত হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যও হুমকির মধ্যে পড়ে। খামারের বর্জ্য যদি বায়োগ্যাস, বায়ো-কম্পোষ্ট, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রভৃতি উৎপাদনে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে খামারের বর্জ্য জঞ্জাল থেকে সম্পদে রুপান্তরিত হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা হয় অন্যদিকে জৈব জ্বালানী, জৈব সার উৎপাদন হয় যা খামার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও লাভবান করে তোলে।

গবাদিপশুর খামারের বর্জ্য দুইভাবে ব্যবহার করা যায়- ১. বায়োগ্যাস তৈরীর মাধ্যমে ২. বায়ো-কম্পোষ্ট তৈরীর মাধ্যমে।

বায়োগ্যাস কী?

পচনশীল যে কোন জৈব পদার্থ গরুর গোবর, মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে ব্যাক্টেরিয়াল ডি-কম্পোজের ফলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয় তাই বায়োগ্যাস। এই গ্যাস প্রধানত: মিথেন (CH_4) গ্যাস। যখন গোবর/বিষ্ঠা পানির সাথে মিশিয়ে বায়ো-ডাইজেস্টারে বায়ুশূণ্য অবস্থায় উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা হয় তখন অনুজীব এর ক্রিয়ার ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্নার জন্য খুবই কার্যকর। উৎপন্ন তাপের হিসেবে ১ ঘন মিটার বায়োগ্যাস (৬০% মিথেন) ০.৭৬ লিটার কেরোসিন, ৫.২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ৪.৮ কেজি জ্বালানী কাঠ এবং ৮.৬ কেজি খড়ের সমান তাপ উৎপন্ন করে।

বায়োগ্যাসকে জৈব গ্যাস বলা হয়। বায়োগ্যাস প্রধানত মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এর মিশ্রণ। তবে অন্যান্য গ্যাসেরও সামান্য উপস্থিত পাওয়া যায়। নিচের টেবিলে জৈব গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের গঠনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো।

বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র ঃ

পদার্থ	শতকরা হার	
	প্রাকৃতিক গ্যাস	বায়োগ্যাস
মিথেন	৯৫-৯৮	৬০-৭০
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০.১-০.২	৩০-৪০
হাইড্রোজেন	-	২-২.৫
নাইট্রোজেন	০.৪	১-১.৫
অক্সিজেন	০.১	০.৩-০.৪
হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.১-০.২

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ঃ

১। পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায় ২। ধোঁয়া হয় না ফলে পাতিল এবং রান্নাঘর কালো হয় না ৩। কেরোসিন, লাকড়ি বা খড়কুটো লাগে না ফলে জ্বালানীর খরচ বাঁচে ৪। সময় বাঁচে এবং রান্নার পাশাপাশি অন্য কাজও করা যায় ৫। লাকড়ির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চোখ জ্বালা করে এবং শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ ৬। পরিবেশ দূষণ হয় না ৭। বায়ো-স্লারি জৈব সার হিসেবে ব্যবহারে অধিক ফসল পাওয়া যায়। ৮। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো যায়। ৯। জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা যায় ১০। বাড়ী ও দোকানে গ্যাস সরবরাহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে কি কি লাগে?

গোয়ালঘর অথবা রান্নাঘরের আশেপাশে ২০০ বর্গফুটের মতো খোলামেলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যায়। বাড়ির মালিকের কমপক্ষে ৩টি গরু অথবা ২০০টি লেয়ার মুরগী থাকতে হবে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির আনুমানিক খরচ ঃ

পরিবারের লোকসংখ্যা ও গরু বা মুরগির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্ল্যান্টের আকার ছোট বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও কম বেশি হবে। মোট নিমার্ণ ব্যয়ের মধ্যে আছে নির্মাণ সামগ্রী, নিমার্ণ শ্রমিক মজুরি, চুলা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং সার্ভিস চার্জ/ইঞ্জিনিয়ারিং ফি।

আকার ভেদে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের খরচ ও ব্যবহার নিম্নের টেবিলে বর্ণিত হলো ঃ

প্ল্যান্টের আকার (ঘনমিটার)	কত ঘন্টা জ্বলে	প্রতিদিন কত গোবর লাগে (কেজি)	কয়টি গরু থাকতে হবে	প্ল্যান্ট স্থাপনের আনুমানিক খরচ (হাজার টাকা)
২.০	৩-৪	৪০	৩	৪০-৪৫
২.৪	৪-৫	৬০	৪	৫০-৫৫
৩.২	৬-৮	৮০	৬	৫৫-৬৫
৪.৮	১০-১২	১২০	৮	৬৫-৭৫

ফাইবার বায়োগ্যাস প্ল্যান্টঃ

বর্তমানে ইট, সিমেন্ট, বালু দিয়ে মাটির নিচে যে বায়োগ্রাস প্লান্ট তৈরী করা হয় ব্যয় বহুল এবং নষ্ট হলে মেরামত করা কষ্টকর। বতর্মানে প্লাষ্টিক ফাইবার দিয়ে নির্মিত বিভিন্ন সাইজের প্লান্ট দেশে তৈরী এবং ব্যবহার হচ্ছে।

ফাইবার বায়ো ডাইজেস্টার এর সুবিধাসমূহ ঃ

১. দ্রুত ও সহজে স্থাপন করা যায়।
২. স্থায়িত্বকাল ন্যূনতম ৩০ বছর।
৩. লিকেজ/ফাটল ধরার সম্ভাবনা কম।
৪. অল্প জায়গায় স্থাপনযোগ্য।
৫. সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
৬. ওজনে হালকা ও পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বায়ো কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি ঃ

খামারের বর্জ্য-গোবর, চনা, খড়কুটা, ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে বায়ো কম্পোস্ট তৈরি করা যায়।

পিট পদ্ধতিতে বায়ো কম্পোস্ট তৈরি ঃ

পিট তৈরী ঃ ৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ৩টি পিট পাশাপাশি তৈরী করতে হবে। পিটগুলি মাটির গর্ত করে বা স্থায়ীভাবে ইট দিয়েও তৈরী করা যায়। পিটের উপর চালা তৈরী করতে হবে এতে বৃষ্টির পানি পিটে প্রবেশ রোধ করবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে জৈব সারকে রক্ষা করবে। পিটের আকার প্রাপ্ত বর্জ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে।

- পিটের তলায় শুকনো বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন খড়, কচুরীপানা, গাছের শুকনো পাতা, বাড়ির আর্বজনা ইত্যাদি ১৫-২০ সে.মি পুরো করে বিছিয়ে দিতে হবে। এই সকল শুকানো জৈব পদার্থ গোবর-চনার জলীয় অংশ শুষে নেয়।
- পিটের তলায় বিছিয়ে দেওয়া শুকনো জৈব পদার্থের উপর খামার বর্জ্য স্তরে স্তরে জমা করতে হবে। যদি সম্ভব হয় স্লারি বা গোবর সমানভাবে জৈব পদার্থের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়।
- গোবর সমান ভাবে ছড়িয়ে দেবার পর ৪ সে.মি ছোট করে কাটা খড় বা অন্য কোন শুকানো জৈব পদার্থ বিছিয়ে দিতে হবে। খড় বা জৈব পদার্থের আবরণ গোবরকে রোদে শুকানো থেকে রক্ষা করে গাছের খাদ্য উপাদান নষ্ট হওয়া রোধ করে।
- পিটের মধ্যে পর্যায়ক্রমে গোবর, চনা এবং শুকনো খড় বা জৈব পদার্থ স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পিট সম্পূর্ণভাবে ভর্তি করতে হবে।
- পিট সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে একটি পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে ১৫দিনের জন্য রেখে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পিটে কোন পানি বা বাতাস প্রবেশ করতে না পারে।
- ১৫দিন পর প্রথম পিটের বর্জ্যকে ২য় পিটে স্থানান্তর করতে হবে। স্থানান্তরের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন উপরের বর্জ্য নীচে যায় এবং নীচের বর্জ্য উপরে আসে। পিটের উপর পূর্বের মত পলিথিন দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে পুনরায় ১৫দিন রাখতে হবে।
- ১৫দিন পর ২য় পিটের বর্জ্য একই ভাবে ৩য় পিটে স্থানান্তর করতে হবে এবং পুনরায় ১৫দিন ঢেকে রাখতে হবে। ১৫দিন (সর্বমোট ৪৫দিন) পর ৩য় পিটের বর্জ্য উত্তম কম্পোষ্ট সারে পরিনত হবে এবং তা পিট থেকে বের করে হালকা রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করতে হবে।
- ১ম পিটের বর্জ্য ২য় পিটে স্থানান্তরের পর ১ম পিটে পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পূরণ করতে হবে এবং পূর্বে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এভাবে কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

- বায়ো কম্পোষ্ট **তৈরির মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত বর্জ্যের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়।**
- বায়ো কম্পোষ্ট **তৈরি মাধ্যমে খামারের** যাবতীয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও আগাছা ধ্বংস করা যায়।
- বায়ো কম্পোষ্ট তৈরীর ফলে খামারের বর্জ্যের দূর্গন্ধ দূর করা যায়।
- বায়ো কম্পোষ্ট সহজে প্যাকিং ও পরিবহণ করা যায়।
- বায়ো কম্পোষ্ট ব্যবহারে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।
- বায়ো কম্পোষ্ট বিক্রি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা যায়।
- বায়ো কম্পোষ্ট তৈরীতে তেমন কোন বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় না।

বায়ো-স্লারি ঃ

গরুর গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা বায়োগ্যাস ডাইজেস্টারের ভিতরে পরিপাক বা কোমলায়িত হওয়ার পর আউটলেট দিয়ে অর্ধতরল অবস্থায় বের হয়ে আসলে তাকে বায়ো-স্লারি বলে। বায়ো-স্লারি একটি অতি উন্নত মানের জৈব সার। ইহা তরল, শুকনো কিংবা কম্পোস্ট আকারে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি ব্যবহারের উপকারিতা ঃ

১। উন্নত মানের জৈব সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করে মাটির জৈব পদার্থ বজায় রাখার মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।
২। বায়ো-স্লারিতে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের গুনগতমান (প্রাপ্যতা) সনাতন জৈব সার যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কমপোস্ট অপেক্ষা বেশী থাকে বলে এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্ভিদ সহজে গ্রহন করতে পারে।
৩। রাসায়নিক সারের সাথে বায়ো-স্লারি ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয়, অধিকন্তু জমিতে দরকারী জৈব পদার্থ যোগ হয়।
৪। অম্লীয় মাটিতে বায়ো-স্লারি ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়।
৫। বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষায় ব্যবহার করা যায়।
৬। টবে ফুলের গাছ ও বাড়ীর ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে বায়ো-স্লারি ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক।
৭। পুকুরে কিংবা মৎস্য খামারে ব্যবহার করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৮। ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
৯। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বায়ো-স্লারি প্ল্যান্টের আউটলেট থেকে নালা অথবা পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পিটের সংগ্রহ করতে হয়। যদি পিট নির্মাণ করা সম্ভব না হয় তা হলে প্লাষ্টিকের ড্রামেও স্লারি সংগ্রহ করা যায়। বায়ো-স্লারি পিট বায়োগ্যাস প্লান্টের একটি অভিন্ন অংশ। একে বাদ দিয়ে প্ল্যান্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ওভার ফ্লোর পাইপের নিকটে দুটি পিট থাকবে যেন বায়ো-স্লারি অতি সহজে পিটে জমা হতে পারে।
- পিটগুলি হাইড্রোলিক চেম্বার হতে কমপক্ষে ১০০ সে.মি দুরত্বে রাখা দরকার যেন মাটি সরে গিয়ে হাইড্রোলিক চেম্বারের কোন ক্ষতি করতে না পারে। দুটি পিটের আয়তন ডাইজেস্টারের আয়তনের সমান হতে হবে।
- বাস্তবতার আলোকে আয়তন ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিবর্তন করা যাবে। পিটের গভীরতা ১ মি: এর বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে স্লারি সংগ্রহ কঠিন হতে পারে। পিটের চারপাশের উঁচু করে বাঁধ দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে।

বিবিধ-৪

Acronyms

Abbreviation	Full Name	Abbreviation	Full Name
AG	Agri Business	PPP	Public Private Partnerships
BSTI	Bangladesh Standard and Testing Institute	PPR	Public Procurement Rule
CSA	Climatic Smart Agriculture	PPR	Pesti des Petits Ruminant
CTC	Chief Technical Coordinator	PPs	Project Proposals
DH	Dairy Hubs	PO	Producer Organization
DPP	Development Project Proposal	PG	Producer Group
DDB	Dairy Development Board	PPE	Personal Protection Equipment's
BDRI	Bangladesh Dairy Reaserch Institute	PEC	Project Evaluation Committee
BPRI	Bangladesh Poultry Reaserch Institute	TA	Technical Assistance
TMR	Total Mixed Ration	TOR	Terms of Reference
PMU	Project Management Unit	USAID	United State Agencies for International Development
PIU	Project Implementation Unit	WB	World Bank
SME	Small & Medium Enterprises	VC	Value Chain
VMCC	Village Milk Collection Centre	MDG	Millennium Development Goal
FFS	Farmers Field School	LDDP	Livestock and Dairy Development Project
FOs	Farmer Organizations	MG	Matching Grant
FYP	Fifth Five year Plan	MGS	Matching Grant Scheme
FCR	Feed Conversion Ratio	MoU	Memorandum of Understanding
GHG	Green House Gas	MOFL	Ministry Osf Fisheries and Livestock
HH	House Hold	NDDB	National Dairy Development Board
HACCAP	Hazard Analysis and Critical Control Point	FG	Farmers Group
MVC	Mobile Veterinary Clinic	OIE	Office of the International Epizootic (World Organization for Animal Health)
LFA	Livestock Field Assistant	UMS	Urea Molasses Staw
LSP	Local Service Provider	UMB	Urea Molasses Block
IMED	Implementation Monitoring Evaluation Division	SDG	Sustainable Development Goal
LIPP	Livestock Insurance Pilot Program	UN	United Nation
HRM	Humane Resource Management	HRD	Human Resource Development

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ফরমের নুমনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

প্রশিক্ষণ শিরোনাম : ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
প্রশিক্ষণ মেয়াদ : ৫ দিন।
প্রশিক্ষণ ভ্যানু : .....।

প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যাবলী

[নিচের ছকটি পূরণ করুন (* চিহ্নিত স্থানটি পূরণ আবশ্যকীয়)]

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
পিতার নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
মাতার নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
কর্মস্থল	বাংলা *	:
	English Block Letter*	:
পদবী*		:
জাতীয় পরিচয় পত্র নং		:
লিঙ্গ		:
বৈবাহিক অবস্থা		:
জন্ম তারিখ *		:
জাতীয়তা *		:
ভাষাগত দক্ষতা*	বাংলা	:
	ইংরেজি	:
	অন্যান্য	:
ধর্ম*		:
স্বাস্থ্যগত অবস্থা		:
রক্তের গ্রুপ		:

শিক্ষাগত যোগ্যতা*	ডিগ্রি/সার্টিফিকেট	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের সাল	জিপিএ/বিভাগ

স্থায়ী ঠিকানা*	:
বর্তমান ঠিকানা	:
ইতিপূর্বে কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উল্লেখ করুন*	:
*ইমেইল/ফেসবুক/টুইটার/অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার ঠিকানা (যদি থাকে)	:
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর*	:
জরুরী যোগাযোগ *	:
অন্যান্য তথ্য	:

তারিখ প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ও পর্যালোচনা ছক

প্রশিক্ষনার্থীরা নীচে তাদের মতামত লিখবেন এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাকারীকে ফেরত দেবেন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন।

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত		মন্তব্য (মতামত ব্যাখ্যা করুন)
১.	এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগে আপনি কি কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন?	হ্যাঁ	না	
২.	এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানেন কি?	হ্যাঁ	না	
৩.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন কি?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৪.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৫.	আপনার কর্মপরিধির কতটুকু প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৬.	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৭.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি সন্তোষজনক দিক উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.		
৮.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি অসন্তোষজনক দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.		
৯.	এই প্রশিক্ষণ চলাকালে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে সমস্যার ধরণ ঃ	১. ২. ৩.		
১০.	এই প্রশিক্ষণের উন্নয়নে আপনার তিনটি সুপারিশ লিখুন।	১. ২. ৩.		

রেফারেন্স সমূহঃ

১. Handbook of Veterinary Pharmacology-Walter H. Hsu.
২. Veterinary Pharmocology and Therapeutics (Tenth Edition)-Jim E. Riviere, Mark G.Papich.
৩. Casarett and Doull's Toxicology the Basic Science of Poisons (Sixth Edition)-Curtis D. Klaassen.
৪. Veterinary Toxicology-Radhey Mohan Tiwari, Malini Sinha.
৫. A Practical Handbook of Dairy Husbandry, NDDB, India.
৬. The Vets' Solution (3rd edition)- Asst. Prof. Dr. Raihana Nasrin Ferdousy Sharmin.
৭. প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত রোগ প্রতিরোধ টীকা বুকলেট।
৮. প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, বিএলআরআই।
৯. ফার্মাকোলজি এন্ড টক্সিকোলজি, ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প।
১০. আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী খামারির প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
১১. মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
১২. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং বাস্তবায়ন কৌশল, ডা. মো: সালেহউদ্দিন খান, এনএটিপি-২।
১৩. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১৪. ন্যাশনাল লাইভস্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট উদ্যোক্তা উন্নয়ন মডিউল।

Notes

মুদ্রণে: দি প্রিন্ট মিডিয়া
২৫৭ ফকিরাপুর, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০